আইআইআইটি অকেশনাল পেপার সিরিজ

ইসমাইল রাজি আল ফারুকি

ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম

ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম

মূল
ইসমাইল রাজি আল ফারুকি

অনুবাদ
ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

সম্পাদনা
আহমদ হোসেন মানিক

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম

ইসমাইল রাজি আল ফারুকি

অনুবাদস্বত্ব
বিআইআইটি

প্রকাশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (৩য় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩৯৪৯, ০১৪০০ ৪০৩৯৫৮

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মূল্য
১২৫.০০ টাকা

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৬৭৩১-৯-৪

Bengali version of *'The Essence of Islamic Civilization'*; published by BIIT Publications; 302, Books and Computer Complex Market (2nd Floor), 38/3, Banglabazar, Dhaka-1100, E-mail: biitpublications@gmail.com; publication: September 2023. Price: Tk 125.00

ভূমিকা

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি) ২১ নং অকেশনাল পেপার হিসেবে ইসমাইল রাজি আল-ফারুকির *ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম* (The Essence of Islamic Civilization) উপস্থাপন করতে পেরে খুবই আনন্দিত। এটি আসলে ইসমাইল রাজি আল-ফারুকি এবং লোইস লামিয়া আল-ফারুকির *দ্য কালচারাল অ্যাটলাস অব ইসলাম* (১৯৮৬) গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল, যা ইসলামের সমগ্র বিশ্বদর্শন, এর বিশ্বাস, ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বে এর স্থান উপস্থাপন করে এমন একটি স্মারক ও প্রামাণিক কাজের অংশ। মানচিত্রগুলো এবং দুটি অ্যারাবেস্ক ছাড়া অন্য সব ছবি আপডেট করা হয়েছে, যা মূল বইয়ের নয়।

প্রফেসর ইসমাইল রাজি আল-ফারুকি (১৯২১-১৯৮৬) ছিলেন একজন ফিলিস্তিনি-আমেরিকান দার্শনিক, দূরদর্শী এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন অথরিটি। ইসলামের এ মহান সমসাময়িক স্কলারের পাণ্ডিত্য ইসলাম অধ্যয়নের পুরো সীমাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন: ধর্মের অধ্যয়ন, ইসলামী চিন্তাধারা, জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, নন্দনতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং বিজ্ঞান। সন্দেহাতীতভাবে আল-ফারুকি বিংশ শতাব্দীর মহান মুসলিম স্কলারদের অন্যতম। এ অকেশনাল পেপারে তিনি ইসলামের অর্থ এবং বাণী সমগ্র বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে তিনি তাওহিদকে (আল্লাহর একত্ব) ইসলামের মর্মকথা এবং প্রথম নিয়ামক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা ইসলামী সভ্যতাকে এর পরিচয় দিয়েছে।

ইসলামী দূরদৃষ্টি, মূল্যবোধ এবং মূলনীতিকে ভিত্তি করে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রচেষ্টাগুলোকে সহযোগিতা করার জন্য ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত আইআইআইটি একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। গত ত্রিশ [বর্তমানে বিয়াল্লিশ] বছরে প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা প্রোগ্রাম, সেমিনার এবং কনফারেন্সগুলোর ফলাফল হলো ইংরেজি এবং আরবিতে চার শতাধিক গ্রন্থের প্রকাশনা, যার বেশিরভাগই অন্যান্য প্রধান ভাষাসমূহে অনূদিত হয়েছে।

আনাস এস. আল-শাইখ-আলি
অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজার, আইআইআইটি লন্ডন অফিস

সূচি

ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম ॥ ৭

বিশ্বদর্শন হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ৮

দ্বৈততা ॥ ৮

আদর্শিকতা ॥ ৯

পরমকারণবাদ ॥ ৯

মানুষের ক্ষমতা ও প্রকৃতির নমনীয়তা ॥ ১০

দায়িত্ব ও বিচার ॥ ১২

সভ্যতার মূলভিত্তি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ১২

তাওহিদের পদ্ধতিগত দিক ॥ ১২

একতা ॥ ১২

যুক্তিবাদ ॥ ১৪

সহনশীলতা ॥ ১৭

তাওহিদ তত্ত্বের বিষয়বস্তুর মাত্রা ॥ ১৮

অধিবিদ্যার মূলনীতি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ১৮

নীতিবিদ্যার মূলভিত্তি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ২০

মূল্যবোধতত্ত্বের মূলনীতি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ২৩

সামাজিকতাবাদের মূলনীতি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ২৬

নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ২৮

তথ্যনির্দেশ ॥ ৩৫

ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম

নিঃসন্দেহে এটি বলা যায় যে, ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম হচ্ছে ইসলাম; অন্যদিকে ইসলামের সারমর্ম হচ্ছে *তাওহিদ*– আল্লাহকে এক, পরম, অতীন্দ্রিয় স্রষ্টা, প্রভু এবং সবকিছুর মালিক বলে নিশ্চিত করা।

মৌলিক আঙিনায় এ দু'টি স্বতঃসিদ্ধ। যারা এ সভ্যতার অন্তর্গত বা এতে অংশ নিয়েছিল তারা এ দু'টিকে কখনও সন্দেহ করেনি। অতি সম্প্রতি ধর্মপ্রচারক, প্রাচ্যবিদ এবং ইসলামের অন্যান্য ব্যাখ্যাকারীরা এগুলোকে তাদের সন্দেহের শিকার করেছেন। শিক্ষার স্তর যাই হোক না কেন, মুসলিমরা আপাদমস্তকভাবে নিশ্চিত যে, ইসলামী সভ্যতার একটি সারমর্ম আছে, এই সারমর্মটি জ্ঞাত এবং বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করতে সক্ষম, এটি *তাওহিদ*।[১] ইসলামী সভ্যতার প্রথম নির্ধারক নীতি হিসেবে, সারমর্ম হিসেবে তাওহিদের বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

তাওহিদ হচ্ছে সেই জিনিস যা ইসলামী সভ্যতাকে তার নিজস্ব পরিচিতি দিয়েছে, যা এর সমস্ত উপাদানকে একত্রে আবদ্ধ করে এবং এভাবে তাদের একটি অবিচ্ছেদ্য জৈবদেহে পরিণত করে, যাকে আমরা সভ্যতা বলি। *তাওহিদ* বা একত্ববাদ সভ্যতার সব উপাদানকে একক প্রভুর আনুগত্যে পুনর্গঠিত, পুনর্বিন্যস্ত করেছে। সভ্যতার বাহক মানুষের সমগ্র জীবনকে *তাওহিদ* পুনর্গঠন করে। এটি যেন সভ্যতার প্রতিটি উপাদানকে নতুন ছাঁচে গঠন করে। এই পুনর্গঠনের মাত্রা উপাদান ভেদে ক্ষুদ্র থেকে বিশাল হতে পারে। এটি নির্ভর করবে একত্ববাদ ওই বিষয়টিকে ঠিক কীভাবে দেখতে চায়। সভ্যতার প্রতিটি উপাদানের ওপর একত্ববাদের দর্শনের এ প্রভাবের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকেই সকল মুসলিম স্কলারের নজরে এসেছে। সেজন্যে তাঁরা *তাওহিদ* এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাওহিদের প্রয়োগ নিয়ে অনেক লিখেছেন। তাঁদের গবেষণার এক বড় অংশই *তাওহিদ* নিয়ে। তাঁরা বুঝতেন যে, *তাওহিদ* এমন একটি নিয়ন্ত্রণকারী মূলনীতি, যা

থেকে উৎসারিত হয় জীবন পরিচালনার বাকি সব নীতি ও কর্মসূচি। এটি যেন এক বিশাল ঝর্ণাধারার উৎসমুখ, যা থেকে সৃষ্ট পানি প্রবাহিত হতে হতে বিশাল নদীতে পরিণত হয়।

সহজভাবে বলতে গেলে *তাওহিদ* মানে হচ্ছে আন্তরিকভাবে বুঝেশুনে এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, 'আর কোনো প্রভু নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া'। তাওহিদের ঘোষণা প্রদানের এ কালিমার শুরুতে আল্লাহ ছাড়া সব উপাসনার দাবিদারদের দাবি উপেক্ষা করার নেতিবাচক ঘোষণাই আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণাকে বলীয়ান করেছে। কালিমার এ ছোট বাক্যটি যেন এক পরিপূর্ণ সংস্কৃতি, এক বিশাল ইতিহাসকে কয়েকটি শব্দের ফ্রেমে সংক্ষেপে চিত্রায়িত করেছে। *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*– এ একটি বাক্য ইসলামী সমাজ ও সভ্যতাকে দিয়েছে ভিন্ন পরিচয়, বৈচিত্র্য, ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা। মুসলিম সভ্যতাকে উপনীত করেছে মানবসভ্যতার সর্বোচ্চ সোপানে।

বিশ্বদর্শন হিসেবে *তাওহিদ*

তাওহিদ হচ্ছে মহাজগত, স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বের এক মহাসত্য এবং বাস্তবতা। এটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে নিম্নোক্ত মূলনীতিসমূহ:

দ্বৈততা

আমাদের দেখা এবং উপলব্ধির জগতকে আমরা দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা: ঐশ্বরিক এবং অনৈশ্বরিক; স্রষ্টা এবং সৃষ্ট। এ জগতের স্রষ্টা একজনই। তিনি মহান আল্লাহ, পরিপূর্ণ সর্বশক্তিমান। তিনিই সৃষ্টিজগতের একমাত্র উপাস্য; তিনি চিরন্তন, জগতের পালনকর্তা, জগতের সবকিছুই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, তাঁর ক্ষমতা সর্বব্যাপ্ত; কোনোকিছুই তাঁর সমকক্ষ বা সমগোত্রীয় নয়; যখন কিছু অস্তিত্বমান ছিল না তখনও তিনি ছিলেন; যখন সবকিছু বিলীন হবে তখনও তিনি বহাল থাকবেন; তাঁর কোনো অংশীদার বা সন্তানাদির প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে স্রষ্টার সমস্ত সৃষ্টিজগতই স্থান-কালের সীমায় সীমাবদ্ধ; এ জগতের মধ্যে আছে পৃথিবী, গ্রহ-তারকারাজি, মহাবিশ্ব; ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব থেকে শুরু করে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণি, মানুষ, জিন এবং ফেরেশতা, বেহেশত-দোজখ সবই। জগতের যেখানেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সেখানেই স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সম্পর্ক পরিস্ফুট হয়; সর্বত্রই সৃষ্টির এক স্রষ্টা থেকে

তৈরি হওয়ার এবং স্রষ্টার ওপর নির্ভরতার প্রমাণ বিদ্যমান। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি কখনো একীভূত হতে পারে না। অন্যকথায়, কোনো সৃষ্টি কখনও কোনোভাবেই স্রষ্টার সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারে না।[২]

আদর্শিকতা

বাস্তবতার দু'টি ক্রমের মধ্যে সম্পর্কটি আদর্শগত প্রকৃতির। মানুষের মধ্যে এর সম্পর্কটি হচ্ছে বুঝার কার্যক্ষমতা। মানুষের বোধির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তাঁর মেধা, অনুভব করার যোগ্যতা, মনে রাখার যোগ্যতা, কল্পনাশক্তি, যুক্তি, দৃষ্টি তথা অন্তর্দৃষ্টি, অন্তর্জ্ঞান ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের যথেষ্ট পরিমাণ বোধি বা মেধা আছে, যা দিয়ে অবলীলায় সে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করে। তাদের বোধি নিম্নলিখিত দু'টি উপায়ে স্রষ্টার ইচ্ছাকে বুঝার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী : যখন সেই ইচ্ছা স্রষ্টার দ্বারা সরাসরি মানুষের কাছে কথায় প্রকাশ করা হয় এবং যখন স্রষ্টার ইচ্ছা সৃষ্টির পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমিত হয়।[৩]

পরমকারণবাদ

মহাবিশ্বের প্রকৃতিই এমন যে, তা উদ্দেশ্যমূলক, পরিকল্পিত; কোনো কার্যকারণ বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন বা বিশৃঙ্খলভাবে কিছু সৃষ্টি হয়নি। সবকিছুই এক ধীমান স্রষ্টার নিখুঁত পরিকল্পনার বা ছকের অংশ হিসেবে তৈরি হয়েছে। মহান আল্লাহ কোনোকিছু অর্থহীন, খেলার ছলে বা উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি।[৪] এটি কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলেও তৈরি হয়নি। মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু মহান উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে; মহান স্রষ্টার মহা পরিকল্পনায় এটি অনুপম শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত; এটির সৃষ্টি কোনো বিশৃঙ্খলা বা দুর্ঘটনার ফসল নয় বরং পরিকল্পনার অংশ।[৫] প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম এবং শৃঙ্খলার মাঝেই এর সৃষ্টির নেপথ্যে স্রষ্টার মহাপরিকল্পনার বিষয়টি অনুভব করা যায়। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি উপাদানই মহান স্রষ্টার নিয়মের অধীন। একমাত্র মানুষেরই রয়েছে নিজ ইচ্ছামতো ভালো বা মন্দ পথে চলার স্বাধীনতা।[৬] সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষই একমাত্র সত্তা, যাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেছেন; এ মানুষের মাধ্যমে তিনি জগত পরিচালনা করিয়ে নেন; মানুষের শরীরবৃত্তীয় কাজকর্ম অন্য প্রাণীদের মতোই; কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক এবং বোধি তার মাঝে এক স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিকতা বা নীতিবোধের জন্ম দিয়েছে। মানুষ আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য না করে নিজের নফসের বা শয়তানের দাসে পরিণত হলে জগতে হানাহানি

এবং বিপর্যয় তৈরি হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জগতের শৃঙ্খলা ধরে রাখতে মানুষের একটি অত্যাচারী জাতিকে আরেকটি জাতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন; ইতিহাসে বিলুপ্ত সভ্যতাগুলো আমাদের সেই দীক্ষাই দেয়।[৭]

মানুষের ক্ষমতা ও প্রকৃতির নমনীয়তা

যেহেতু সবকিছুই একটি উদ্দেশ্যের জন্য তৈরি করা হয়েছে– এর সামগ্রিকতা কোনো অংশে কম নয়– সেই উদ্দেশ্যের উপলব্ধি স্থান ও কালের মধ্যেই সম্ভব।[৮] অন্যথায় নিন্দিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সৃষ্টি নিজেই এবং স্থান ও সময়ের প্রক্রিয়ায় সেখানে অর্থ ও তাৎপর্য হারাবে। এ সম্ভাবনা ছাড়া *তাকলিফ* বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা মাটিতে পড়ে যায়; এবং এর পতনের সাথে স্রষ্টার উদ্দেশ্য বা তাঁর শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। পরমকে উপলব্ধি করা যথা মানুষ তার নিজস্ব বোধের মাধ্যমেই তাঁর সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর মহান উদ্দেশ্য তথা তার নিজের জীবনের মিশন সৃষ্টি এবং বিচার দিবসের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে। নৈতিক কর্মের বিষয় হিসেবে মানুষকে তাই নিজেকে, তার সহকর্মী বা সমাজ ও প্রকৃতি বা তার পরিবেশ পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে হবে, যাতে তার নিজের এবং তাদের মধ্যে স্রষ্টার আদর্শ বা আদেশ বাস্তবায়িত হয়।[৯]

নৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিষয় হিসেবে মানুষ এবং তার সহকর্মী ও পরিবেশ সকলকেই অবশ্যই মানুষের কার্যকরী ক্রিয়া গ্রহণ করতে সক্ষম হতে হবে। এ ক্ষমতা বিষয় হিসেবে কর্মের জন্য মানুষের নৈতিক ক্ষমতার বিপরীত। এটি ছাড়া নৈতিক কর্মের জন্য মানুষের ক্ষমতা অসম্ভব হবে এবং মহাবিশ্বের উদ্দেশ্যমূলক প্রকৃতি ভেঙে পড়বে। আবার, নিন্দুক থেকে কোনো অবলম্বন হবে না। সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য আছে এবং এটি একটি প্রয়োজনীয় অনুমান, যদি স্রষ্টা স্রষ্টা হন এবং তাঁর কাজ অর্থহীন কোনো বানরের কাজ *(travail de singe)* না হয় তাহলে সৃষ্টি হতে হবে নমনীয়, রূপান্তরযোগ্য– এর পদার্থ, গঠন, অবস্থা এবং সম্পর্ক পরিবর্তন করতে সক্ষম– যাতে মানুষের ধরণ বা উদ্দেশ্যকে মূর্ত বা সংহত করা যায়। এটি মানুষের শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতিসহ সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সত্য। সৃষ্টিজগতের সবকিছু স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী নিজেদের পুনর্গঠিত বা পুনর্সজ্জিত করার সামর্থ্য রাখে।[১০]

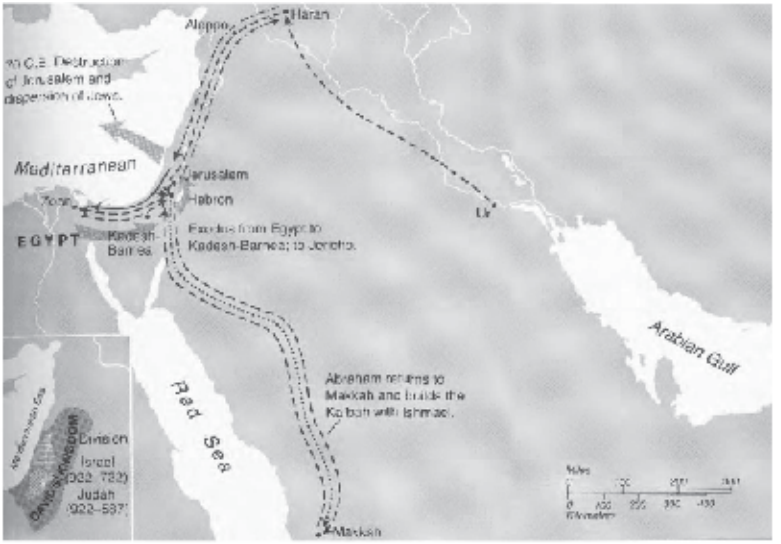

----➤ ইবরাহিমের হিজরত

.....➤ ইবরাহিম, হাজেরা এবং ইসমাইলের মক্কায় হিজরত

– · –➤ হারানের পথে ইয়াকুব; ফিরতি পথে তাঁর ছেলে ইউসুফকে আরব মরুযাত্রীর দল মিশরে নিয়ে যায়

——➤ ইয়াকুবের সন্তানদের মিশরে যাওয়া এবং হেবরনে ফিরে আসার পথ

খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০০ সাল থেকে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মক্কার কুরাইশ এবং ইসহাকীয় হিব্রুদের অবস্থান।

মক্কাবাসী এবং হিব্রুরা রক্তসম্পর্কীয় (Cousins)। উভয়েই নিম্ন মেসোপটেমিয়া বা উরের একই পূর্বপুরুষ আবরাহাম বা ইবরাহিমের বংশধর। আব্রাহাম তার কওমের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার বিরুদ্ধে তাদের বিচার থেকে অলৌকিকভাবে পালিয়ে গিয়ে যাযাবর আমুররু গোত্রের লোকদের সাথে যোগ দেন এবং কেনানে আসেন। তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইশমায়েল বা ইসমাইলকে মক্কায় বসতি স্থাপন করান, যেখানে তারা কাবা নির্মাণ করেছিলেন এবং ইসমাইল মক্কার কুরাইশ গোত্রকে শাসন করেছিলেন। আব্রাহামের অপর পুত্র ইসহাক এবং তার বংশধররা কেনানে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল; কিন্তু প্রায় এক সহস্রাব্দ তা করতে পারেনি, যে সময়ে তারা হয় এ এলাকায় ঘুরাঘুরি করেছে অথবা মিশরে চলে গিয়েছে। তারা পরবর্তী সহস্রাব্দে কেনানে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু তারা কেনানের সাথে আত্মীকরণ এবং এর থেকে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পড়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কেনানে তাদের অবস্থান ধ্বংসের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল এবং বেঁচে থাকা লোকেরা পরবর্তী দুই সহস্রাব্দে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

দায়িত্ব ও বিচার

যেহেতু মানুষকে আল্লাহ এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে, সে নিজেকে, তার সমাজ ও পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারে; সেহেতু তার এটি দায়িত্ব যে, সে তার পারিপার্শ্বিক সমাজকে আল্লাহর নির্ধারিত পথে পরিচালিত করবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সে সমগ্র সৃষ্টিকুলের সাথে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করবে। পরিবেশ ও প্রকৃতির যে শৃঙ্খলা আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই শৃঙ্খলা বা বৈচিত্র্যের কোনো ব্যত্যয় ঘটাবে না। এ আদর্শনিষ্ঠা মানুষের 'সহজাত'।[১১] বিচারদিবস স্থানকালের মধ্যে বা এর শেষে বা উভয়ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয় কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে এটি অবশ্যই ঘটবে। আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ-নিষেধকে উপলব্ধি করা ও তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করা হলো *ফালাহ* বা সাফল্য অর্থাৎ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করা। যদি তা না করা হয়, তাঁর অবাধ্য হওয়া মানে শাস্তি, কষ্ট, অসুখ এবং ব্যর্থতার যন্ত্রণা ভোগ করা।

সভ্যতার মূলভিত্তি হিসেবে *তাওহিদ*

ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি বা সারমর্ম হচ্ছে *তাওহিদ*। সভ্যতার ভিত হিসেবে তাওহিদের দু'টি দিক আছে: একটি হচ্ছে পদ্ধতিগত, অপরটি হচ্ছে বিষয়গত। প্রথমটি সভ্যতার প্রথম মূলনীতিগুলোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নির্ধারণ করে, দ্বিতীয়টি সেই মূলনীতিকে ধারণ করে সৌধ নির্মাণ করে।

তাওহিদের পদ্ধতিগত দিক

তাওহিদের প্রায়োগিক বিস্তৃতি তিনটি মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলো হচ্ছে: একতা, যুক্তিবাদ এবং সহিষ্ণুতা। এগুলো ইসলামী সভ্যতার রূপ নির্ধারণ করে, এমন একটি রূপ যা এর প্রতিটি বিভাগে বিস্তৃত।

একতা : একতা বা ঐক্য ছাড়া কোনো সভ্যতা গড়ে ওঠে না। সভ্যতার সকল উপাদান যথাযথভাবে পরস্পর সংযুক্ত, মিশ্রিত এবং সুসংবদ্ধ না হয়ে বিচ্ছিন্ন থাকলে তা একটি সমাজ-সভ্যতা জন্ম না দিয়ে এক জগাখিচুড়ি কিছু উৎপন্ন করবে। প্রতিটি সভ্যতার উপাদানগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত একটি নিখুঁত কাঠামোতে নিয়ে আসতে এর নেপথ্যে একটি মূলনীতি ক্রিয়াশীল থাকতে হয়। এই মূলনীতিই নির্ধারণ করবে সভ্যতা গঠনে কোন উপাদান কী পরিমাণে, কোনটির ওপর কোনটির অগ্রাধিকার থাকবে। ইসলামী সভ্যতারও সকল উপাদান তাওহিদের মূলনীতির ভিত্তিতে পরস্পর সংযুক্ত। তাওহিদের

মাঝে এমন অনুপম নির্দেশনা আছে যে, এটি চলমান ইসলামী সভ্যতার সকল উপাদানকে যথার্থভাবে সংযুক্ত করতে সক্ষম এবং একই সাথে ভিন্ন উৎস বা সভ্যতা থেকে আগত যেকোনো প্রয়োজনীয় উপাদানকে ইসলামী সভ্যতায় আত্মস্থ করার যোগ্যতাও রাখে। কোনো সভ্যতাই শতভাগ পরিপূর্ণ বা স্বয়ংক্রিয় নয়। আমরা ইতিহাস দেখলে এটিই বুঝবো যে, প্রতিটি সভ্যতাই ভিন্ন সভ্যতা এবং সংস্কৃতি থেকে অনেক উপাদান গ্রহণ করেছে। এখানে যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে ভিন্ন উৎস থেকে উপাদান নিয়ে তাকে নিজ সভ্যতার ছাঁচে পুনর্গঠিত করে আত্মস্থ করার যোগ্যতা সেই সভ্যতার আছে কিনা? যেসব সভ্যতা একেবারেই ভিন্ন উৎস থেকে উপাদান নিতে অক্ষম, সেসব সভ্যতা স্থবির হয়ে ধ্বংস হয়; অন্যদিকে যেসব সভ্যতা ভিন্ন উৎসের উপাদানকে নিজের আদর্শের ছাঁচে পুনর্গঠন করতে পারে না, বরং অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয় সেই সভ্যতা নিজেই নিজেকে অপর সভ্যতায় বিলীন করে দেয়। এ ধরনের আত্মধ্বংসী এবং অন্য সভ্যতার উপাদানকে নিজের আদর্শে পুনর্গঠনে ব্যর্থ অন্ধ অনুকরণকারী সভ্যতা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে যে সভ্যতা অন্য উৎস থেকে আগত উপাদান, সংস্কৃতি বা প্রযুক্তিকে নিজ সংস্কৃতির ছাঁচে পুনর্গঠিত করে আত্মস্থ করতে পারে তার সেই ক্ষমতা দিয়ে বুঝা যায় যে, ওই সভ্যতা একটি প্রাণবন্ত, বর্ধিষ্ণু সভ্যতা; যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে এবং সজীব রাখতে সক্ষম। *তাওহিদ* ইসলামী সভ্যতাকে এই সজীবতা এবং চির নবীনতা দান করেছে; কারণ তাওহিদের ছাঁচেই মুসলিমরা যেকোনো নতুন প্রযুক্তি, সংস্কৃতিকে পুনর্গঠিত করে নিজ সভ্যতার উপযোগী করে আত্মস্থ করে। ফলে আজ ইসলামী সভ্যতা সাফল্যের সাথে দেড় হাজার বছর বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, পুরানো প্রযুক্তির বিদায় এবং নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, শিল্প বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাঝেও নিজের মৌলিকত্ব নিয়ে সামনে এগুচ্ছে। এর ভিত্তিতে তারা নতুন সংস্কৃতিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে গ্রহণ করছে অথবা অগ্রহণীয় হলে বর্জন করছে। এভাবে ইসলামী সভ্যতা সবসময় গতিশীল থাকছে।

তাওহিদের মূল কথাই হচ্ছে আল্লাহই একমাত্র উপাস্য, তাঁর ক্ষমতা সবার ক্ষমতার সীমাকে ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ। সৃষ্টির সবকিছুই একমাত্র তাঁর পরিকল্পনা এবং তাঁরই আদেশ পালনের জন্য সৃষ্ট। কাজেই তাঁর ইবাদাতের অনুকূল করেই মানুষের সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। মানুষের পরিচালনায় পৃথিবীর বাকি সবকিছুকে আল্লাহ যে শৃঙ্খলা এবং নিয়মের অধীনে রেখেছেন সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা অব্যাহত রেখেই প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতি গ্রহণ বা বর্জন বা ব্যবহার করতে হবে। তার চিন্তা, কর্ম এবং জীবনের লক্ষ্যই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তার জীবন কিছু বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল ঘটনা নয়, বরং এটি একটি বিশাল লক্ষ্যে চালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপের সমন্বিত প্রচেষ্টা, যা তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির দরজার পর দরজা উন্মুক্ত করে তার জীবনকে স্রষ্টার নৈকট্যের মহান সাফল্যে উদ্ভাসিত করে। এভাবে তার জীবনের একটি একক শৈলী রয়েছে, একটি অবিচ্ছেদ্য রূপ যা সংক্ষেপে ইসলাম।

আল-কুরআন

যুক্তিবাদ : যুক্তিবাদ তাওহিদের তথা ইসলামী সভ্যতার একটি অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতি। ইসলামের যুক্তিবাদ তিনটি নিয়ম মেনে চলে; যথা– প্রথমত, অবাস্তব যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান; দ্বিতীয়ত, যেকোনো বৈপরীত্য পরিহার; তৃতীয়ত, নতুন কিছুকে গ্রহণ করার মতো উদারতা বা প্রশস্ততা। প্রথম মূলনীতিটি মুসলিমদের যেকোনো নতুন জ্ঞানকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে বিনা যুক্তিতে মেনে নেয়া থেকে রক্ষা করে।[১২] মুসলিমরা সত্য ছাড়া আর কিছুই দাবি করে না। দ্বিতীয় মূলনীতিটি তাকে সরল দ্বন্দ্ব ও কূটকৌশল থেকে রক্ষা করে।[১৩] এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, ইসলামে যুক্তিবাদ মানে ওহি বা প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানের ওপর যুক্তির প্রাধান্য নয়; বরং ওহি বিষয়ে যেকোনো দ্বিধা বা ভ্রান্তির নিরসন।[১৪] যুক্তিবাদ যেকোনো জ্ঞানকে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে তার মধ্য থেকে সত্যজ্ঞানকে নিশ্চিত করায়। এটি ওহিলব্ধ জ্ঞানের সঠিক মর্ম বুঝতে সাহায্য করে। এটি ওহির পাঠককে পৃথিবীর অন্য সব জ্ঞানের ওপর ওহির প্রয়োগ করতে সক্ষম করে। জ্ঞানী মুসলিমরা যুক্তিবাদী; কারণ তারা সত্যের দু'টি উৎসের ওপর গুরুত্ব

আরোপ করে। তা হলো– প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞান এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করা পার্থিব জ্ঞান।

যুক্তিবাদের তৃতীয় মূলনীতিটি মুসলিমদের নতুন যেকোনো জ্ঞান বা প্রযুক্তি গ্রহণে উদার এবং বিশাল হৃদয়বান করে। এটি অন্ধ অনুকরণ নয় বরং যুক্তিভেদ্য জ্ঞানের চর্চার তাগিদ দেয়। যুক্তিবাদী হওয়ার পর তাদের আবার বিনয়ী হওয়ার তাগিদ দেয়; সে সকল যুক্তিভেদ্য বিদ্যা অর্জনের পর গর্ব বা দম্ভ করে না; বরং নিজ মন থেকেই স্বীকৃতি দেয় *আল্লাহু আলম* (আল্লাহই উত্তম জানেন)। কারণ সে এটি বোঝে যে, চূড়ান্ত মহাসত্য এবং মহাজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জানা; মানুষ তার সমস্ত যোগ্যতা ব্যয় করে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের কিয়দংশই অর্জন করতে পারে।

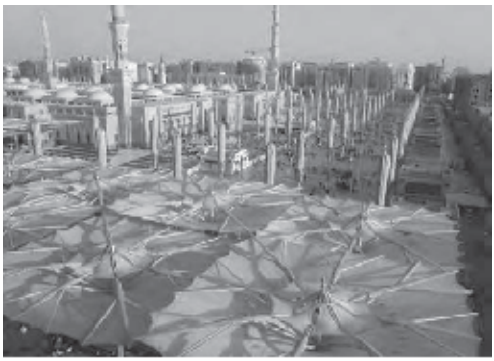

মদিনায় মসজিদে নববি

তাওহিদের মাধ্যমে আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি দিয়ে সব সৎ এবং সত্যের সাথে একাত্ম হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইসলামের মতে, এক আল্লাহই চূড়ান্ত সত্য। তাঁর একত্ব জগতের সকল সত্যের উৎসসমূহের একত্ব। তিনিই সমগ্র জগত-প্রকৃতির একমাত্র স্রষ্টা। তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করেন। মানুষের জ্ঞানজগতের সকল বিষয়ই আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই স্রষ্টা এবং নির্মাতা হিসেবে ওইসব বিষয়ের চূড়ান্ত জ্ঞান আল্লাহর কাছেই আছে। তিনিই মানুষকে ওহির মাধ্যমে জ্ঞান দেন। তাঁর জ্ঞান সর্বাত্মক, সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত। তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন পুরস্কার বা জান্নাত দেওয়ার জন্যে; তিনি মানুষের কল্যাণকামী; তিনি মানুষকে শাস্তি দিতে আগ্রহী নন; মানুষ তার আমলের মাধ্যমে ভালো অর্জন করলে তিনি ভালো দেবেন; আবার মানুষ মন্দ অর্জন করলে সে বিনিময়ে তাই পাবে। তাঁর রায় মানুষের আদালতের রায়ের মতো পরিবর্তনশীল নয়। কারণ, তিনি মানুষের সকল কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। আর তাই তাঁর বিচার নির্ভুল। তিনি নিখুঁত, নির্ভুল, সর্বজ্ঞ, সর্বোৎকৃষ্ট।

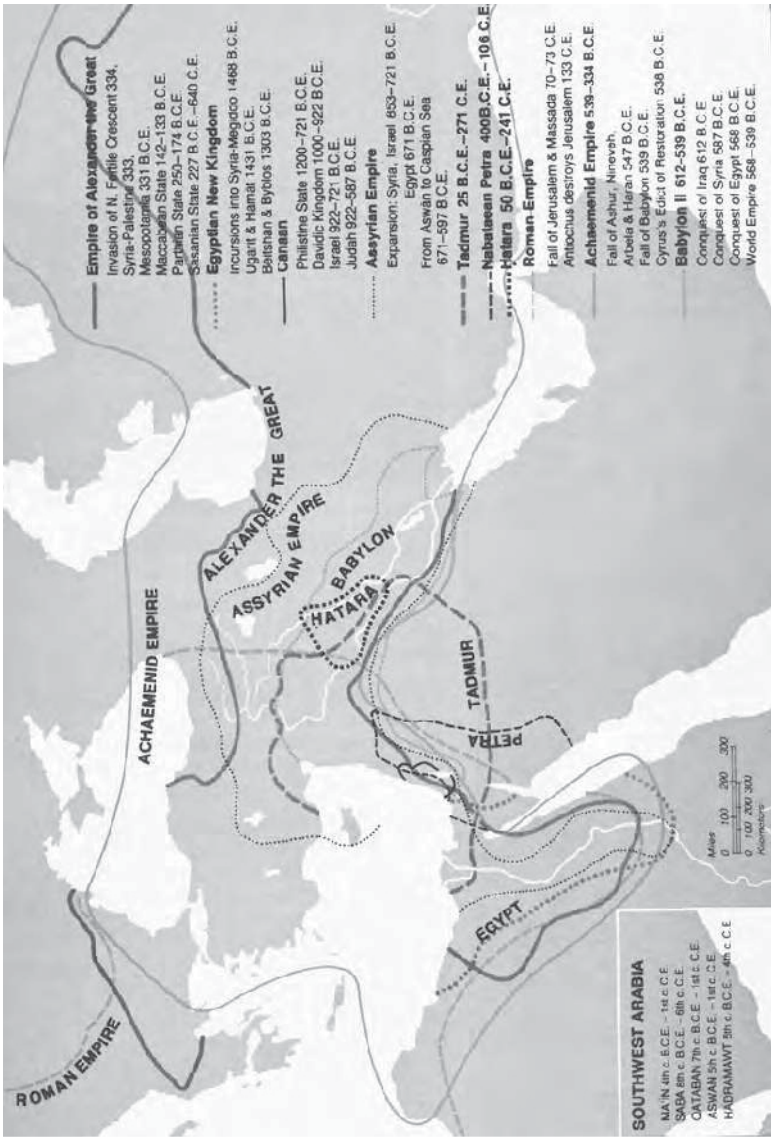

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ : আদর্শবাদ ছাড়া শক্তি এবং অশান্তি।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে আরবি থিয়েটার অগ্নিজগতের সাম্রাজ্যের উত্থান এবং ব্যর্থতা দেখেছিল : অ্যাসিরিয়ান, দ্বিতীয় ব্যাবিলনীয়, পার্সিয়ান, হেলেনিস্টিক এবং রোমান এই অঞ্চলের বারোটি রাজ্যের কোনোটিরই মিশনের অনুভূতি ছিল না।

সহনশীলতা: তাওহিদের অন্যতম প্রায়োগিক নীতি হিসেবে যুক্তিবাদ মানে হচ্ছে বর্তমান বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার প্রবণতা, যতক্ষণ তা আল্লাহর বিধানের অনুগামী থাকে। এটি জ্ঞানের এবং নীতিবিদ্যারও একটি মৌলনীতি। এটি মুসলিমদের একটি সহনশীল মধ্যপন্থি উম্মত হিসেবে চালিত করে। তারা কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ইতিবাচক থাকে, যতক্ষণ না তার নেতিবাচক কিছু দৃষ্টিগোচর হয়।[১৫] এর প্রথমটিকে ইসলামের পরিভাষায় *সাহ* এবং দ্বিতীয়টিকে *ইয়ুসর* বলা হয়। এ দুটোই মুসলিমদের বিশ্বজগত থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকার মতো চরম রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামি হতে মুক্ত রাখে। এ দুটোই মুসলিমদের জীবনে সবকিছুকে ইতিবাচকভাবে নিতে উৎসাহিত করে। দুটো বিষয়ই তাকে যেকোনো নতুন জ্ঞান বা প্রযুক্তি যথাযথ মানদণ্ডে পরীক্ষা করে গ্রহণ করতে চালিত করে। এভাবে সে নিজে সমৃদ্ধ হয়; তার সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়।

তাওহিদের অন্যতম নীতি হিসেবে সহনশীলতার মানে এই স্বীকৃতি যে, আল্লাহ কোনো জাতিকেই নীতি-নির্দেশনা না দিয়ে রাখেননি। তিনি প্রতিটি জাতির কাছেই তাঁর বাণীবাহক পাঠিয়েছেন; তাদের শিক্ষা এটি ছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং সকল ইবাদত-আনুগত্য একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য;[১৬] শয়তান এবং তার অনুসারীদের থেকে মানবজাতিকে মুক্ত থাকতে এ নবিগণ তাগিদ দিয়েছেন।[১৭] সহনশীলতার মূলনীতি আরেকটি বিষয় নিশ্চিত করে, তা হচ্ছে প্রতিটি মানুষেরই সহজাত একটি বোধি আছে। এ বোধির উপলব্ধি দিয়ে সহজেই সে প্রকৃত স্রষ্টা এবং তার বিধান সম্পর্কে জানতে পারে। সহনশীলতার সংস্কৃতি আরো একটি প্রত্যয়ের জন্ম দেয়, তা হচ্ছে পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্মের অবস্থান; তা আসলে ইতিহাসের আবর্তনে স্থান-কাল-পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমাজের মানুষের পছন্দ-অপছন্দ, অনুরাগ-বিরাগ, সংস্কার ও কুসংস্কার ইত্যাদির নানা বৈচিত্র্যের ফসল। ধর্মীয় বৈচিত্র্যের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে *আল দ্বীন আল হানিফ* - আল্লাহর আদি ধর্ম, যার সাহায্যে সমস্ত মানুষ জন্মগ্রহণের আগেই তাদের কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী করে তোলে। সহনশীলতার জন্য মুসলিমদের ধর্মের ইতিহাসের অধ্যয়ন করতে হবে, যাতে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহর আদিম দান আবিষ্কার করা যায়, যা তিনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর সমস্ত নবিকে সকল স্থানে এবং সময়ে পাঠিয়েছিলেন।[১৮]

ধর্মে এবং মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে না। সহনশীলতা ধর্মগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক নিন্দাকে ধর্মগুলোর

জন্ম এবং বিকাশের একটি সহযোগিতামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধানে রূপান্তরিত করে, যার ফলে ঐতিহাসিক স্বীকৃতিগুলোকে মূল প্রদত্ত ঐতিহাসিক প্রাপ্তিগুলো থেকে আলাদা করা যায়। মুসলিমদের জীবনে *ইয়ুসর* বা সহনশীলতা বা মধ্যপন্থার অনুসরণ তাদের জীবনের সকল কর্মতৎপরতাকেই পরিশীলিত, পরিমার্জিত এবং অভিজাত করে; তারা একটি মিতচারী লাইফস্টাইল অনুসরণ; জীবনের সকল উত্থান-পতন, প্রাপ্তি-ক্ষয়, শোক-সুখের মাঝেও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট, ধৈর্যশীল থেকে জীবন চালাতে বদ্ধপরিকর থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিশ্চিত করছেন যে, তিনি প্রতিটি কঠিন পরীক্ষার সাথে জীবনকে সহজ *[ইয়ুসর]* করার মতো উপাদানও দিয়েছেন।[১৯] আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের আরও আদেশ করছেন তারা যেন যেকোনো নতুন জ্ঞান যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করে; যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা রায় প্রদানের পূর্বে নিশ্চিত হয় যে, তারা ন্যায়নীতি বিরোধী কিছু করছে না;[২০] এ বিষয়ে একটি শাস্ত্রই গড়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় *উসুল আল ফিকহ* (Jurisprudence)।

মক্কায় পবিত্র কাবাঘর

এভাবেই অধিবিদ্যার মূলসূত্র তাওহিদের দুটো মূলনীতি *সাহ* এবং *ইয়ুসরা* আমাদের দিকনির্দেশনা দেয়; আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে এ পৃথিবীকে আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় চালিত করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে পারে– এটিই মানব সৃষ্টির পিছনে ক্রিয়াশীল আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং মানুষের জীবনের মূল মিশন।[২১]

তাওহিদ তত্ত্বের বিষয়বস্তুর মাত্রা

অধিবিদ্যার মূলনীতি হিসেবে *তাওহিদ* : আল্লাহ ছাড়া আর কোনো *ইলাহ* বা উপাস্য নেই– এই ঘোষণা দেওয়ার মানে এটিই যে, আল্লাহই একমাত্র

স্রষ্টা; তিনি সবকিছুকে অস্তিত্ব দিয়েছেন; তিনিই সবকিছুর শুরুতে ছিলেন এবং জগতসমূহের চূড়ান্ত পরিণতিও তাঁরই হাতে। এমন সাক্ষ্যপ্রদান একদিকে মানুষকে দেয় স্বাধীনতা, অন্যদিকে করে দায়বদ্ধ। স্বাধীনতা এ অর্থে যে, সে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো অধীন নয়; আর দায়বদ্ধতা মানে একমাত্র আল্লাহর কাছেই তার সব ক্রিয়া-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এটি এই স্বীকৃতি দেওয়া যে, আমাদের চারপাশের ঘটমান সব কার্যকলাপ তাঁর নখদর্পণে; তাঁরই ইচ্ছায় আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। একবার এমন এক অনুভূতির জগতে প্রবেশ করলে মানুষ তার জাগ্রত অবস্থায় এক মূহূর্তের জন্যও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অনুভব থেকে দূরে যেতে পারে না। প্রতিটি মুহূর্তেই তাঁর ইচ্ছার অধীনে থাকবে। তাওহিদের দর্শন অন্তরে লালন করতে পারলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার ইচ্ছা এবং কর্ম আল্লাহর ইচ্ছা এবং নিয়ম অনুযায়ী চলতে থাকবে; এটিই প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক নিয়ম।[২২] প্রকৃতিতে আল্লাহর বিধান অপরিবর্তনীয় নিয়ম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা আল্লাহ প্রকৃতিকে দিয়েছেন।[২৩] যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের মাঝে অথবা তার সমাজে আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন দেখবে তখন সে প্রকৃত মানবিক বা সামাজিক বিজ্ঞানের সন্ধান পাবে।[২৪] যখন একজন মুসলিম উপলব্ধি করবে যে, গোটা মহাজগৎ আল্লাহর নিয়ম, ইচ্ছা ও আদেশে পরিচালিত হচ্ছে তখন সে আবিষ্কার করবে যে, মহাজগৎ আসলে মহান স্রষ্টার আদেশে পরিচালিত একটি জীবন্ত নাট্যমঞ্চ। নাট্যমঞ্চে যেমন নাটক-থিয়েটার মঞ্চায়িত হয়, কিন্তু তার নেপথ্যের প্রযোজককে দেখা যায় না, শুধু উপলব্ধি করা যায়; ঠিক তেমনি আমাদের মহাজগতের চালককেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি। নাটকে প্রযোজকের ইচ্ছা বা নির্দেশ অনুসরণই যেমন অভিনেতাদের একমাত্র কাজ, ঠিক জগতেও আল্লাহর বিধান পালনই সৃষ্টিকুলের একমাত্র দায়িত্ব। সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির নেপথ্যে তাদের দিয়ে ইবাদত করানোই আল্লাহর উদ্দেশ্য। আল্লাহর ইচ্ছাই সবকিছুর নেপথ্যে ক্রিয়াশীল।

তাওহিদের এ দর্শন অনুভবকারীর এটি অনিবার্য দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া জগতে বিরাজমান অন্য যেকোনো স্রষ্টার বা উপাসনার দাবিদার শক্তিকে নির্মূল বা অপসারণ করা। বিশ্বজগতে একমাত্র আল্লাহর বিধানই চালু থাকবে; তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। যেকোনো স্বৈরশাসক, ঐশী ক্ষমতার দাবিদার, জাদুকর সবকিছুকে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান তাওহিদের দাবি। তাওহিদের দর্শনের

মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত প্রকৃতিপূজারী ধর্মগুলোকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়, যেসব ধর্মে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন স্রষ্টা নিয়ন্ত্রণ করেন বলে দাবি করা হয়। কাজেই *তাওহিদ* মানে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টার

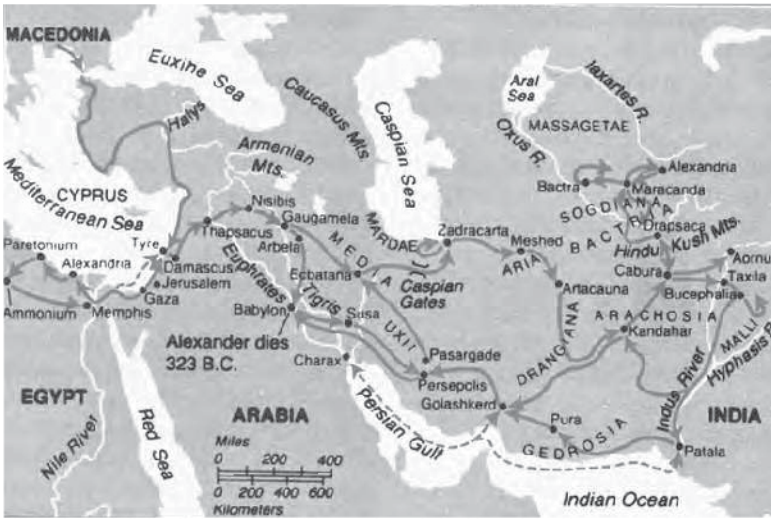

আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের ক্যাম্পেইনসমূহ।

অস্তিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে সবকিছুকে একক প্রভুর অধীনে চিন্তা করার মধ্য দিয়ে জগতে এক ঐক্যের চেতনা জন্ম দেওয়া। একজন তাওহিদবাদী প্রকৃতির সব সৃষ্টির প্রতি দয়ালু ও যত্নবান হবে। কারণ সবকিছু তাঁর একক স্রষ্টার সৃষ্ট। সে যেকোনো অন্ধবিশ্বাস, কল্পকথায় তাড়িত না হয়ে প্রকৃতির মাঝে আল্লাহর বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার রহস্য অনুসন্ধান করবে। সে বুঝবে একত্ববাদের বিনি সুতোর মালায় পুরো জগত ঐক্যবদ্ধ। এ ঐক্যবদ্ধতার অনুভব তার হৃদয়কে করবে বিশাল, মহানুভব। বিজ্ঞান মানে আল্লাহর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অনুপমতা, বিশালতা আবিষ্কার করা।

নীতিবিদ্যার মূলভিত্তি হিসেবে *তাওহিদ* : *তাওহিদ* এটি নিশ্চিত করে যে, আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম গঠনাকৃতি দিয়ে তৈরি করেছেন কেবল তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্য।[২৫] পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের নেপথ্যে একটিই উদ্দেশ্য; তা হচ্ছে পৃথিবীকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চালিত করা।[২৬] কুরআন বলে, মানুষকে আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা তিনি নিতে বলেছিলেন সমগ্র আসমান ও জমিনকে; কিন্তু এ গুরুদায়িত্বের বিশালত্ব দেখে

আসমান ও জমিন দায়িত্ব নিতে ভয় পেয়ে সরে গেল আর মানুষ এগিয়ে এলো।[২৭] মানুষের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত এ মহান দায়িত্ব তাকে আরো নৈতিক এবং আরো দায়িত্বশীল করে। সে আল্লাহর সৃষ্টি প্রকৃতিকে আল্লাহর নিয়মের অধীনে চালু রাখতে সচেষ্ট হয়।

তাওহিদ এটিও নিশ্চিত করে যে, আল্লাহ মানুষকে খেলাচ্ছলে বা কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করেননি। তিনি মানুষকে অনুভূতি দিয়েছেন, বিবেক-বিবেচনাবোধ দিয়েছেন, যুক্তিবাদিতা দিয়েছেন, সর্বোপরি তাঁর রুহ মানুষের মাঝে ফুঁকে দিয়েছেন।[২৮] এভাবেই মহান আল্লাহ তাঁর দেওয়া গুরুদায়িত্ব পালনে মানুষকে প্রস্তুত করে তুলেছেন।

এ গুরুদায়িত্ব এবং কর্তব্যই হচ্ছে মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য বা কারণ। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের, তার বেঁচে থাকার তাৎপর্যের এটিই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। এ মহান দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ এক বিশাল মর্যাদার অধিকারী হয়। আর যদি মানুষের জাগতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার পেছনে এ মহৎ উদ্দেশ্যটির বাস্তবায়নের কোনো ভাবনাই না থাকে, তবে মানুষ তার সৃষ্টির মর্যাদা হারায়। বিশ্বজগতে আর কোনো সৃষ্টি নেই, যা মানুষের পরিবর্তে দায়িত্ব পালন করতে পারে। মানুষের এ অন্তর্নিহিত নীতিবোধই স্রষ্টার মহান উদ্দেশ্য এবং পৃথিবীর সুষম পরিচালনার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে। মানবসভ্যতা এবং ইতিহাস এভাবেই গড়ে ওঠে।

আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য *(তাকলিফ)* একমাত্র মানুষের ওপরই অর্পিত। এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এর কর্মপরিধির বিস্তৃতি সমগ্র জগতব্যাপী; মানুষের পুরো জীবনব্যাপী। মানুষের নৈতিক দায়িত্বের আওতাভুক্ত সমগ্র মানবজাতি; গোটা জগত এবং আকাশমণ্ডলী তার কর্মক্ষেত্র। জগতে যা কিছু ঘটছে তার দায়-দায়িত্ব মানুষকেই নিতে হবে। কোনো মানুষই তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করতে পারে না। জগতে সংঘটিত যেকোনো অনাসৃষ্টির জন্য মানুষকে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষ তার সাধ্যের মধ্যে জগতকে আল্লাহর বিধানের অধীন রাখতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে; এর ভিত্তিতেই পরকালে তার পুরস্কার বা শাস্তি নির্ভর করছে।

তাকলিফ হচ্ছে মানুষের মানবিক গুণপনার ভিত্তি; মানবিকতার মৌলিক উপাদান এবং সৌধ। মানুষ কর্তৃক আল্লাহর দেওয়া নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ তাকে অন্য যেকোনো সৃষ্ট জীব এমনকি ফেরেশতাদের চাইতেও মহত্তর

করেছে; একমাত্র মানুষই স্বাধীন সত্তা এবং আকল খাটিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে জগত পরিচালনার যোগ্যতা রাখে। শুধু এ কারণে মানুষের বিশ্বজাগতিক মর্যাদা রয়েছে। ইসলামের এ মানবধর্ম বা মানবিকতার সাথে অন্যান্য ধর্ম ও মূল্যবোধের মানববাদের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, গ্রিক সভ্যতা এক সুদৃঢ় মানববাদের জন্ম দিয়েছিল। আধুনিক পশ্চিমা মানববাদ মূলত গ্রিক মানববাদেরই অনুসরণ। রেনেসাঁর সময় থেকেই ইউরোপ গ্রিক মানববাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আপাতত ভালো দেখালেও এই মানববাদ মূলত প্রকৃতিবাদের বাড়াবাড়ির শামিল; এটি মানুষকে একপ্রকার দেবত্ব দেয় এবং তার পাপগুলোকেও দৈবসম্মত বলে মনে করে। এখানে দেখা যায়, স্বর্গের দেবতারা অবলীলায় অম্লানবদনে প্রতারণা করছেন; একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্র করছেন। দেবতারা ব্যভিচার, অজাচারের মতো জঘন্য কাজ করছেন; তাঁদের মধ্যে হিংসা, প্রতিশোধপরায়ণতা, জিঘাংসা সবই সক্রিয়– এই দেবতাদের ধ্যানের উপাদানে পরিণত করে মানুষ যেন তাদের জীবনও ওইসব জঘন্য কাজের চর্চাকে স্বীকৃতি দেয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় খ্রিষ্টধর্মের মানববাদ গ্রিক-রোমান মানববাদের বিপক্ষে যেন এক বিদ্রোহ করেছিল; এখানে আদিপাপের দর্শন দিয়ে মানুষকে সদা পাপের প্রবণতাযুক্ত এক পতিত সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পাপ থেকে দূরে রাখতে *রাহবানিয়াতের* (দুনিয়াত্যাগী, যাজক শ্রেণি) মতো একপেশে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।[২৯]

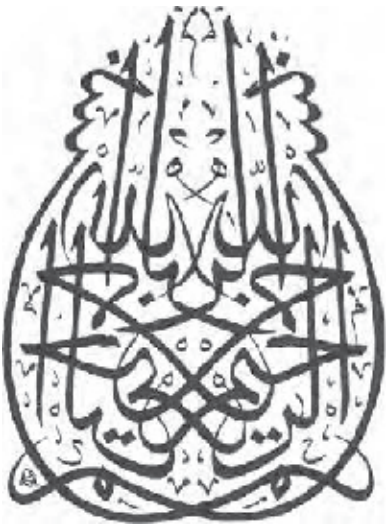

মিররড সিমেট্রিক্যাল ডিজাইনে বাসমালা। [ছবি : এল. আল ফারুকি]

আদিপাপের দ্বারা মানুষ চির পতিত। তাকে এ পতিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ করার জন্য স্বয়ং ইশ্বরকে তার পুত্ররূপে পৃথিবীতে এসে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মানুষকে পাপের দায়মুক্ত করার প্রয়োজন পড়েছিল। এভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে মসিহর প্রতি তৎকালীন শাসকচক্রের নির্মমতার একটি ঐশী যৌক্তিকতা দেওয়া হয়; আর যিশু ত্রাণকর্তা হয়ে মানুষকে আদি-অন্ত পাপের দায় থেকে

অব্যাহতি দেন– এটিই ছিল গ্রিক-রোমান মানববাদের খ্রিষ্টীয় জবাব। অন্যদিকে হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানববাদের জন্ম দেয়। এখানে মানুষের একটি অংশকে দেবত্ব আরোপ করে তাদের হাতে ঐশী নেতৃত্ব দেওয়া হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণ শ্রেণি; এর বিপরীতে থাকে শূদ্র; জন্মই যাদের আজন্ম পাপ। এ জীবনে নিম্নবর্ণের শূদ্র বা দলিতদের উচ্চতর শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কেবল সৎকাজ তথা ব্রাহ্মণের তুষ্টি অর্জন করে পুনর্জন্মে উচ্চতর শ্রেণিতে আরোহণ করে জন্ম নেয়াই একমাত্র সমাধান। গ্রিক-রোমান-খ্রিষ্টান মানববাদের তুলনায় এটিই হচ্ছে ভারতীয় হিন্দু মানববাদ। এশিয়ার আরেকটি প্রধান ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম মানুষের পুরো জীবনটাকেই এক সীমাহীন দুর্ভোগ আর যন্ত্রণা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এখানে জীবনের অস্তিত্বই পাপ; সবসময় জীবনকে মননশীল কর্ম এবং চিন্তার মাধ্যমে পরিশীলিত করে নির্বাণ অর্জন করতে হবে।

এতসব মানববাদের মাঝে তাওহিদের ভিত্তিতে যে মানববাদ সেটিই সবচেয়ে খাঁটি। এখানে আল্লাহই একমাত্র প্রভু এবং উপাস্য; সকল মানুষই *খলিফাতুল্লাহ*; কোনো আদি পাপের দায় তাকে বহন করতে হয় না। তাদের মাঝে কোনো শ্রেণিবিভক্তি নেই; এখানে আল্লাহর নিকটতর সে-ই, যে বেশি আল্লাহভীতি বা তাকওয়া সম্পন্ন। জগতকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চালিত করার এবং আল্লাহর আর সব সৃষ্টিকুলের অভিভাবক হিসেবে মানুষ তার মহান দায়িত্ব পালন করছে। এ মহান দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে আল্লাহ মানুষকে *লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকভিম* করে সৃষ্টি করেছেন। তাওহিদের মানববাদ একজন মুসলিমের জীবনকে ইতিবাচকভাবে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি এবং নিজের প্রতি দায়িত্বশীল করে।

মূল্যবোধতত্ত্বের মূলনীতি হিসেবে *তাওহিদ* : *তাওহিদ* এটিই নিশ্চিত করে যে, আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টিই করেছেন যেন সে তার কর্ম তথা আমলের মাধ্যমে নিজেকে নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করতে পারে।[৩০] সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত বিচারক হিসেবে তিনি মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তার প্রতিটি আমল হিসেব করা হবে এবং বিচারের দিন প্রকাশ করা হবে; সে আমলের ভিত্তিতেই তাদের পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে।[৩১-৩২] *তাওহিদ* আরও নিশ্চিত করে যে, আল্লাহ পৃথিবীকে মানুষের আবাস হিসেবে বানিয়েছেন; মানুষের কল্যাণ এবং আরাম-আয়েশের জন্য পৃথিবীর তাবৎ প্রকৃতিকে আল্লাহ ফুলে-ফলে বৃক্ষ-প্রাণিতে সমৃদ্ধ করেছেন। মানুষ এ

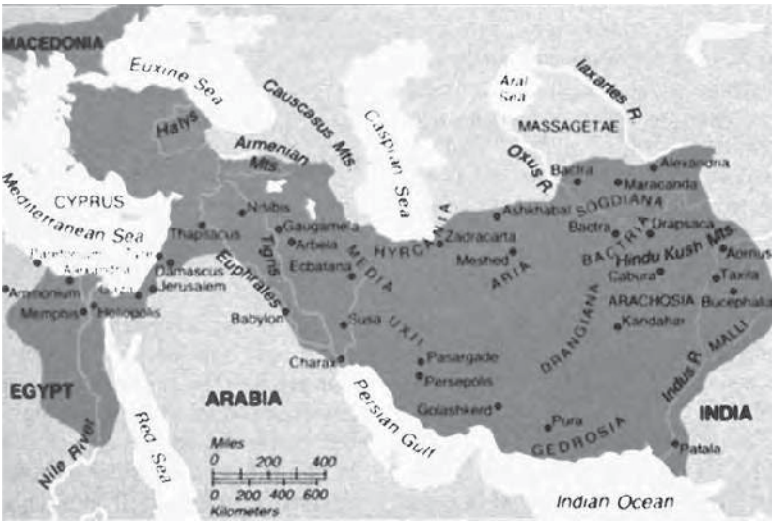

আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের সাম্রাজ্য।

পৃথিবীকে আল্লাহ তায়ালার উপনিবেশ বানাবে,[৩৩] এর যাবতীয় কল্যাণ ও সৌন্দর্য উপভোগ করবে, এর ফল খাবে এবং পৃথিবীর উন্নতি নিশ্চিত করবে; আল্লাহর নিয়ামত উপভোগ করে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে; এতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি।[৩৪] কাজেই *তাওহিদ* দুনিয়াবিমুখ হতে উৎসাহী করে না; বরং আল্লাহপ্রদত্ত দুনিয়ার সৌন্দর্য অবলোকন এবং উপভোগ করে তাঁর প্রশংসা করতেই অনুপ্রাণিত করে। পুরো জগতের তাবৎ সৃষ্টি শুধু আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি মানুষের কল্যাণের জন্য; মানুষের জন্য এটিই পরীক্ষা যে, সে কতটা যুক্তিসংগত এবং নৈতিকতার সাথে পৃথিবীর নিয়ামত উপভোগ করে; সে যেন স্বার্থপরের মতো লুটে না নেয় বরং আল্লাহর নিয়ামতে সকল মানুষের সমান হক– এ বিষয়ে সচেতন থাকে; পৃথিবীকে যেন এমনভাবে উপভোগ না করে যে, তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। পৃথিবীর সম্পদ আহরণ, উৎপাদন এবং বণ্টনের জন্য জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নিজেকে সমৃদ্ধ করা এবং অন্যান্য মানবসম্পদকেও সমৃদ্ধ করা মানুষের দায়িত্ব। তার সুন্দর-সুষম পরিচালনায় পৃথিবী একটি সাজানো বাগানের আরামের আবাসে পরিণত হবে।[৩৫] প্রয়োজনে চাঁদ-সূর্যসহ পৃথিবীর বাইরের গ্রহ-উপগ্রহেও সে সম্পদ বা জীবনধারণের উপাদান অন্বেষণে অভিযান চালাবে; এতে কোনো বাধা নেই।

পার্থিব এবং জাগতিক জীবন ও জগত সম্পর্কে তাওহিদের এ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পুরো সভ্যতার জন্যই কল্যাণকর। এ কল্যাণমুখী সৃষ্টিশীল দর্শনে

ক্যালিগ্রাফি ডিজাইন (আট আল্লাহ পুনরাবৃত্তি)।
[ছবি : এল. আল ফারুকি]

চালিত হয়েই তাওহিদবাদী মানুষ মানব সভ্যতার জন্য কল্যাণকর সব উপাদান তৈরি এবং সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়। তাওহিদের চেতনা যেকোনো দুনিয়াত্যাগী ব্রত যথা সন্ন্যাসবাদ, বৈরাগ্যবাদ, একাকীত্ববাদ, চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা সবকিছুর বিরোধী।[৩৬] অন্যদিকে জাগতিক জীবন সম্পর্কে তাওহিদের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মানে এটি নয় যে, ইসলাম দুনিয়াপ্রেমী বস্তুবাদী হয়ে যেতে বলে; বরং এটি মানুষের মধ্যে এক দায়িত্বশীলতা তৈরি করে যে, পৃথিবীর সবার কল্যাণ নিশ্চিত করেই তাকে এগুতে হবে। সে পৃথিবীর কোনো সম্পদ এমনভাবে ভোগ করবে না, যেন তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিঃশেষ হয়ে যায়। আল্লাহ যে জীববৈচিত্র্যে এবং ভূবৈচিত্র্যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেই বৈচিত্র্য ব্যাহত হয় এমন কোনো কাজ করবে না। আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে কোনো বিশেষ দল, ধর্মমত, জাতি বা গোষ্ঠীর মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ করবে না; কারণ তারা জানে যে, পৃথিবীর সকল নিয়ামত ও সম্পদের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাঁর নিয়ামত প্রাপ্তিতে কোনো মানুষকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। দুনিয়াবি জীবনের প্রতি স্বীকৃতি এবং তা উপভোগে এ সীমাবদ্ধতা বা পূর্বশর্ত তাওহিদভিত্তিক সমাজকে গ্রিক দর্শনভিত্তিক সমাজ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। দুনিয়াকে উপভোগের বিষয়ে গ্রিক দর্শনে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। বলা হতো– তোমার মন যেটিতে আনন্দিত হয় সেটিই নৈতিক, আর মন যেটিতে কষ্ট পায় তা-ই অনৈতিক। এমন দর্শন মানুষকে বল্গাহীন ভোগবাদের দিকে তাড়িত করে। তাইতো সেই অলিম্পাসের সভ্যতা উন্নতির শিখরে উঠে ধপাস করে পতিত হয়েছে। আজ ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় থেকে পশ্চিমা বিশ্বও গ্রিক দর্শনকে পরম পূজনীয় জ্ঞানে আঁকড়ে ধরেছে; এখানে চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটাকেই আধুনিক বা প্রগতিশীল মনে করা হয়। এখানেও বল্গাহীন ভোগবাদ একে একে নৈতিকতার সকল ভিত্তিকে ধ্বংস করে সভ্যতা, পরিবার ইত্যাদিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা বা সমাজের যে সংকট; আজ পাশ্চাত্য মননে যে শূন্যতা; সে শূন্যতা পূরণে এবং সংকট নিরসনে তাওহিদের দর্শনভিত্তিক সমাজ ও সভ্যতাই একমাত্র সমাধান। মানুষের জানা আদর্শগুলোর মধ্যে একমাত্র একত্ববাদই এমন নৈতিকতা দিতে পেরেছে।

সামাজিকতাবাদের মূলনীতি হিসেবে *তাওহিদ* : তাওহিদের দর্শন থেকে এটিই উৎসারিত হয় যে, সমগ্র উম্মাহ তথা সমগ্র মানবজাতি ও সৃষ্টিকুল একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্ট এবং তাঁরই বান্দা; অতএব সবাই তাঁরই ইবাদত করবে।[৩৭] *তাওহিদ* মানে সকল একত্ববাদীরা একই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। তারা একই পরিবারের ভাই-বোনের মতো একে অপরকে ভালোবাসবে; একের সুখে সুখী হবে; অন্যের দুঃখে সমব্যথী হবে; এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতি যেকোনো অন্যায়-অবিচার রোধে এগিয়ে আসবে;[৩৮] তারা পরস্পর সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধরে রাখবে এবং কোনো শয়তানি তাড়না বা প্রলোভনে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।[৩৯] তারা আল্লাহর আদেশ পালনে, সৎকাজের আদেশ দিতে এবং মন্দ প্রতিহত করতে একে অপরকে সহযোগিতা করবে;[৪০] সবাই মিলে আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসূলের অনুসরণ করবে।[৪১]

তাওহিদ দর্শন থেকে উৎসারিত উম্মাহর ভিশন অর্থাৎ কর্মলক্ষ্য একটি; সেই সাথে তাদের অনুভূতি, ইচ্ছা আর কর্মও এক। এটি মানবজাতিকে সমমর্যাদার, সমঅধিকারের বিষয়ে একাত্ম করার সাথে সবার হৃদয়, শরীর এবং আত্মারও ঐক্য আনে। তাদের প্রভু এক, উপাস্য এক, দুনিয়াবি জীবনের লক্ষ্য (আখিরাতে মুক্তি) এক, তারা যেন একই শরীরের বিভিন্ন কোষ বা কোষসমষ্টি। তারা এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। এটি এমন সর্বজনীন, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব যেখানে ভাষাভিত্তিক, ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, বর্ণ-গোত্র-বংশভিত্তিক কোনো বিভাজনের প্রভাব পড়ে না; এটি মানুষকে তার তাকওয়া বা আল্লাহপ্রেমের ভিত্তিতে মর্যাদা দেয়।[৪২] এ উম্মাহর কোনো সদস্য নতুন কোনো জ্ঞান বা প্রযুক্তির সন্ধান পেলে তার দায়িত্ব উম্মাহর সবাইকে তা জানানো। নতুন কোনো খাদ্য বা খাদ্যভাণ্ডারের বা খনিজ সম্পদের খবর জানলে তার দায়িত্ব উম্মাহর সবাইকে তাতে শরিক করা। কেউ প্রতিষ্ঠা, সাফল্য এবং সমৃদ্ধি অর্জন করলে তার কর্তব্য হবে অন্যরাও যাতে তা অর্জন করতে পারে সেজন্যে তাদেরকে সাহায্য করা।[৪৩]

কাজেই একটি কার্যকর, আনুগত্যশীল উম্মাহর উপস্থিতি ছাড়া আমরা তাওহিদের উপস্থিতি বা সুফল অনুভব করতে পারবো না। মানুষের জ্ঞান অর্জন, নীতিবোধ চর্চা ও খিলাফতের অধিকার চর্চার কর্মক্ষেত্র বা মাধ্যম হচ্ছে উম্মাহ। এ উম্মাহর বিস্তৃতি এত বিশাল ও ব্যাপক যে, অমুসলিমরাও মুসলিমদের উম্মাহর কর্মক্ষেত্রের আওতাভুক্ত। উম্মাহর এ ধারণা বর্তমানে মাত্র এক শতক আগে

প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের চাইতেও উন্নত। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষের ওপর রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাধান্য এবং প্রভুত্বকে মেনে নিয়ে রাষ্ট্রগুলোর সংঘ হিসেবে। এর মধ্যে পরাশক্তিগুলোর ভেটো ক্ষমতা ছোট রাষ্ট্রগুলোকে আরও ক্লীব ও মূল্যহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। তাওহিদবাদের উম্মাহ সকল মানুষকে জাতি, রাষ্ট্র, বর্ণ, গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে উঠে এক আল্লাহর খলিফা হিসেবে সমান মর্যাদা দেয়। জাতিসংঘ সনদে অনেক মিষ্টি কথা থাকলেও তা আসলে পরাশক্তিগুলোর ক্রীড়নক। ইউরোপীয় রেনেসাঁ মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রযন্ত্রের যে প্রভুত্ব তৈরি করেছে জাতিসংঘ তাকে আরও বিস্তৃত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দিয়েছে।

বড় দুটো মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট যুদ্ধ থামাতে বা মধ্যস্থতা করতে জাতিসংঘের কিঞ্চিৎ ভূমিকা রয়েছে [তারপরও এটি মনে রাখতে হবে যে, গত শতকের সবচেয়ে জঘন্য জাতিগত নির্মূল অভিযান তথা ইহুদিবাদীদের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের ওপর আগ্রাসন জাতিসংঘের রাবার স্ট্যাম্প ব্যবহার করেই হয়েছে। একই প্রতিষ্ঠানের রাবার স্ট্যাম্প ব্যবহার করে ইরাক, আফগানিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম জনপদে হাজার হাজার টন বোমা ফেলে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ হত্যা করা হয়েছে– অনুবাদক]। এক পরাশক্তির মদদে কোথাও হত্যাযজ্ঞ হলে তা থামাতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের প্রস্তাব উঠলে একটি ভেটোই হত্যাযজ্ঞকে স্থায়ী করতে যথেষ্ট; এটিই জাতিসংঘের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা। অন্যদিকে আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে রাসূল মুহাম্মদ সা. কর্তৃক মদিনা সনদে মদিনার ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। মদিনা সনদে বর্ণিত মানুষের মর্যাদা অধুনা জাতিসংঘের বর্ণনার চাইতে অনেক উন্নত ও টেকসই ছিল। এটি এমন টেকসই মানববাদ দিয়েছিল যে, *খিলাফতে রাশিদার* পর চৌদ্দশত বছর মুসলিমদের অনেক বিপর্যয়ের মাঝেও এই মানববাদ টিকে আছে। এটি এমন স্থায়ী মানববাদী সভ্যতা গড়েছিল যে, চেঙ্গিস খান, হালাকু খানের মতো স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বিজয়ী জাতি বিজিত জাতির ধর্ম গ্রহণ করেছে এমন উদাহরণ একমাত্র ইসলামী তাওহিদবাদী সভ্যতাতেই দেখা যায়।

কাজেই উম্মাহ শুধু একটি সমাজব্যবস্থাই নয়, বরং একটি সমগ্র বিশ্বব্যবস্থাও বটে। এটিই ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি। মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সাথে সমাজ-সভ্যতার সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রখ্যাত দার্শনিক হাবি ইবন

সেলুচি সাম্রাজ্য।

ইয়াকজান (Hayy ibn Yaqzan) এ মহাসত্য আবিষ্কার করেন। দার্শনিক হাবি তাওহিদের মর্ম এবং উম্মাহর ধারণার সাথে এর সম্পর্ক অনুভব করেন। অর্থাৎ তিনি জ্ঞান ও চিন্তার এমন এক উৎসধারার সন্ধান পান *(তাওহিদ)* যা স্রোতস্বিনী নদী হয়ে উম্মাহ নামক মহাসাগরে উপনীত হয়েছে। কাজেই সংক্ষেপে উম্মাহবাদই হচ্ছে একত্ববাদ।

নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে *তাওহিদ* : *তাওহিদ* মানে সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎ থেকে স্রষ্টার দাবি অস্বীকার করা। প্রকৃতিতে বিরাজমান সবকিছুই তা যত সুন্দর, উজ্জ্বল বা শক্তিশালীই হোক না কেন তা হচ্ছে সৃষ্টি; সবকিছুই মহাপরাক্রমশালী এক স্রষ্টার সৃষ্টি। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনোকিছুতেই অলৌকিকত্ব বা অতীন্দ্রিয় কিছু নেই; সবকিছুই সময়, কাল, স্থানের সীমায় সীমাবদ্ধ। কোনো সৃষ্টবস্তু কখনোই নিজের মাঝে দেবত্ব বা দেবত্বের কোনো উপাদান লাভ করতে পারে না। সৃষ্ট জগতের কোনো বিষয়বস্তু দিয়ে আল্লাহর সত্তা, সৌন্দর্যের বর্ণনা বা উপমা দেওয়া সম্ভব নয়।[88] আমাদের দেখা জগতের ভিত্তিতে আল্লাহর জাত, সিফাত বা সৌন্দর্য সম্পর্কে কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের নন্দনতত্ত্ব আমাদের জ্ঞাত প্রকৃতি এবং জগতের বিষয়ের সৌন্দর্যেই সীমাবদ্ধ। সুন্দর বলে যাদের বা যেসব বিষয়কে আমরা স্বীকৃতি দিই সেসব বিষয় হলো

সেগুলোই, যেগুলো প্রকৃতির মাঝে দৃষ্টি বা উপলব্ধির সীমায় আমাদের অনুভবে আগে থেকে বিরাজমান সুন্দরের উপমার সাথে মিল আছে। আমাদের অনুভবের বাইরেও প্রকৃতিতে বিরাজমান অনেক সৌন্দর্যই আমরা বর্ণনা করতে বা উপলব্ধি করতে অক্ষম। যেমন আমরা একটি নির্দিষ্ট আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘের বাইরে কোনো রংয়ের অস্তিত্ব অনুভব করি না; নির্দিষ্ট শব্দ তরঙ্গ দৈর্ঘের বাইরে কোনো শব্দ অনুভব করি না; এটিই আমাদের নন্দনতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা। একটি ক্যামেরায় তোলা ছবি হয়তো ব্যক্তির পরিচিতি বা পাসপোর্টের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং মূল্যবান বিষয়, আবার অন্যদিকে একটি শৈল্পিক কর্ম হিসেবে হয়তো একেবারেই মূল্যহীন। শৈল্পিক কর্ম বলতে বুঝায় প্রকৃতির যেকোনোকিছুকে তার মূল মর্ম ও সৌন্দর্য সহকারে উপলব্ধি করা। অতঃপর তার এমন প্রতিরূপ তৈরি করা যাতে মূল জিনিসের বাহ্যিক এবং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য দুটোই প্রস্ফুটিত হয়।

কাজেই শিল্প মানে প্রকৃতির মধ্য থেকে অপ্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অনুভব করার চেষ্টা। প্রায়ই এ নন্দনচর্চা বা শিল্পচর্চা করার সময় মানুষ তার অনুভবের সুন্দর বা মহৎ বা শক্তিশালী বিষয়গুলো বর্ণিত বা চিত্রায়িত করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়। কারণ, তার দেখা সুন্দরের উপমার চাইতেও তার চোখে ভালো লাগার বা শ্রদ্ধার ব্যক্তিটিকে তার আবেগে সুন্দরতর করে উপস্থাপনের এক তাড়না তার মাঝে কাজ করে। এভাবে মানুষের শ্রদ্ধার বা সম্মানের মানুষটিকে শ্রদ্ধা করতে করতে এক সময় তার মধ্যে দেবত্ব আরোপ করা হয়। এটিকেই গ্রিকরা বলেছিল অ্যাপোথিওসিস বা একজন মানুষের দেবত্বে রূপান্তর। মানুষ বিশেষভাবে এ ধরনের রূপান্তরিত মানুষকে পূজা করে এবং তাদের দেবতা হিসেবে বিবেচনা করে। আধুনিক পশ্চিমা মানুষের অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে কোনো দেবতার প্রতি সামান্যই সহনশীলতা রয়েছে। কিন্তু যতদূর নৈতিকতা এবং আচার-আচরণ সম্পর্কিত, মানুষের আবেগ ও প্রবণতার আদর্শিকতা থেকে তিনি যে 'দেবতা' সৃষ্টি করেন তা তার কর্মের প্রকৃত নির্ধারক।

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের প্রাণকেন্দ্রে আস-সায়াকিরিনি মসজিদের চমৎকার প্রেয়ার হল।

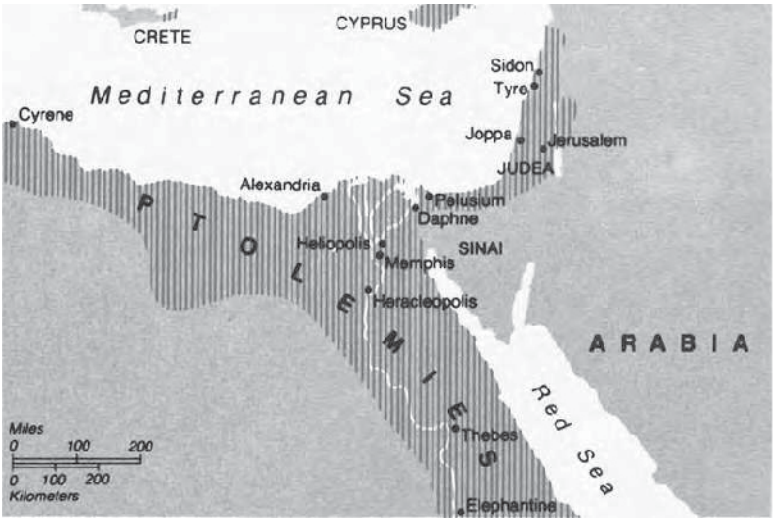

টলেমাইক রাজ্য।

প্রাচীন গ্রিসের প্রায় সকল দেব-দেবীই অপূর্ব সুন্দর মানব-মানবী বা পশু-পাখির রূপে চিত্রায়িত অথবা ভাস্কর্য আকারে তৈরি ছিল। তাদের কাজ ও রচনায় ওইসব দেব-দেবীর সৌন্দর্য, শক্তি, প্রজ্ঞা, কলাকৌশল ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা ছিল। আমরা ধরে নিতে পারি যে, সেই গ্রিকরা তাদের দেখা পূজনীয় মানুষগুলোর প্রতিচ্ছবিই তাদের দেব-দেবীর বৈশিষ্ট্যের মাঝে আরোপ করেছে। তাদের চেনা-জানা সৌন্দর্য-সৌকর্যের সকল উপকরণ দিয়ে তারা তাদের দেব-দেবীগুলোর ছবি-ভাস্কর্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এভাবে তারা মানুষের ওপর দেবত্ব আরোপ করেছে।

মানুষকে দেবতা বানানোর প্রতিযোগিতায় গ্রিকদের চাইতে রোমানরা আরো একধাপ এগিয়ে যায়। গ্রিকরা তাদের প্রিয় মানুষগুলোর ওপর দেবত্ব আরোপ করেছিল; অন্যদিকে রোমানরা এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করে, যেখানে সম্রাট আক্ষরিক অর্থেই ঈশ্বরের মতো অসীম ক্ষমতা নিয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাষ্ট্রের মালিক সেজে বসতেন। তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অনুরাগ-বিরাগ দিয়েই নির্ধারিত হতো রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভাগ্য।

গ্রিক দেব-দেবীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ইত্যাদিতেও লিপ্ত দেখা যেত। কারণ, তাদের দেখা বড় মানুষগুলোকেও তারা একই কাজে লিপ্ত দেখত। তাদের সৃষ্ট মহাকাব্য এবং অন্যান্য রচনা সাধারণত বিয়োগান্তক পরিণতি দিয়ে শেষ হতো; কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল বিয়োগান্তক পরিণতির মাধ্যমে মানুষের

ব্লু মসজিদ, ইস্তানবুল, তুরস্ক।

সকল মন্দ কাজের পাপমুক্তি ঘটে। আর এ পাপমুক্তির সুযোগটিই মন্দ মানুষরা খুব সুন্দরভাবে তাদের দুষ্টপ্রবৃত্তি চর্চার কাজে ব্যবহার করত।

এ ছিল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বের সভ্যতাগুলোর নন্দনতত্ত্ব চর্চার নমুনা। গ্রিক-রোমান নন্দনতত্ত্ব যেখানে সৌন্দর্যের মাঝে, শক্তির মাঝে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে; ইসলাম সেখানে নিরেট নিরাসক্তভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছে। ইসলামের নন্দনতত্ত্বের এ মহান বৈশিষ্ট্যটি প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ G. E. von Grunebaum উপলব্ধি করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ইসলামের কোনো দৃশ্যমান শিল্পকলা (ভাস্কর্য, পেইন্টিং, মহাকাব্য) নেই; কারণ প্রকৃতিতে প্রকাশ্যে মূর্ত কোনো ব্যক্তি, বৃক্ষ, পশু-পাখিরূপে ইসলামের কোনো ইলাহ নেই; এখানে বহুপ্রভুও নেই যারা একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব বা দ্বন্দ্ব করবেন।[৪৫] যদিও তিনি ইসলামের সমালোচনা করতে গিয়েই এমন মন্তব্য করেছেন; কিন্তু অবচেতনভাবেই তিনি তাওহিদভিত্তিক নন্দনতত্ত্বের মহান দিকটি আবিষ্কার করেছেন। ইসলাম ধর্ম বা এর অনুসারীরা কখনই সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব চর্চা করতে গিয়ে সৃষ্টির সৌন্দর্য বা বিশালত্ব দেখে প্রলুব্ধ হয়ে তার মাঝে দেবত্ব আরোপ করেননি; তাওহিদবাদীদের এই দৃঢ়তাই আজ দেড় হাজার বছর ধরে ইসলামকে তার শিকড়ে অটল রেখেছে। পৃথিবীর যত মুশরিক ধর্ম বা মত, মূর্তিপূজারী আদর্শ সবই ভ্রান্তপন্থায় নন্দনতত্ত্ব চর্চার ফসল। আজ পশ্চিমা বিশ্বও একই ভ্রান্তির পথে ধাবমান।

ইহুদিরা পূর্বে ঈশ্বরের সীমা অতিক্রম করে যেকোনো 'খোদাই করা মূর্তি' তৈরি করা থেকে বিরত থাকায় জোর দিয়েছিল এবং সেই ঐশ্বরিক আদেশের আনুগত্য করে তাদের পুরো ইতিহাসে যেকোনো দৃশ্যমান শিল্প থেকে প্রায় সম্পূর্ণ প্রত্যাহারে নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল।[৪৬] যদিও মিশরীয়, গ্রিক বা রোমান সভ্যতার প্রভাবে ইতিহাসের কোনো কোনো সময় ইহুদিদেরও ভাস্কর্য বা পেইন্টিংয়ের চর্চায় দেখা গিয়েছে; তবুও নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মাধ্যমে ইহুদিদের স্বাধিকার লাভ এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে লীন হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের নন্দনতত্ত্বচর্চা তাওহিদের চেতনার প্রতিকূলে ছিল না।

তাওহিদ শৈল্পিক সৃজনশীলতার বিরুদ্ধে নয়; বা এটি সৌন্দর্য উপভোগের বিরুদ্ধেও নয়। পক্ষান্তরে, তাওহিদ সুন্দরকে আশীর্বাদ করে এবং তা প্রচার করে। এটি কেবলমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর প্রকাশিত ইচ্ছা বা কথায় পরম সৌন্দর্য দেখতে পায়। একইভাবে, এটি তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একটি নতুন শিল্প তৈরি করায় সচেষ্ট ছিল। আল্লাহ ব্যতীত কোনো *ইলাহ* নেই– এই

মালির জেননে গ্রেট মসজিদ।

ধারণার জায়গা থেকে মুসলিম শিল্পী দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন যে, প্রকৃতির কিছুই আল্লাহকে প্রকাশ বা বর্ণনা করতে পারে না। স্টাইলাইজেশনের মাধ্যমে,

তিনি প্রকৃতি থেকে প্রাকৃতিক জিনিসকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রাকৃতিক জিনিস প্রকৃতি থেকে এত দূরে সরে গিয়েছিল যে, এটি প্রায় অচেনা হয়ে ওঠে। তার হাতে, স্টাইলাইজেশন ছিল একটি নেতিবাচক যন্ত্র, যার দ্বারা তিনি প্রতিটি প্রাকৃতিক জিনিসকেই বলেছিলেন 'না!'– সৃষ্টবস্তু নিজেই সৃষ্টি হতে পারে না। প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে মুসলিম শিল্পী দৃশ্যমান আকারে এই নেতিবাচক রায় প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো *ইলাহ* নেই। মুসলিম শিল্পীর এই *শাহাদাহ* (সাক্ষ্য) প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করতে পারাকে অস্বীকারের সমতুল্য।

সেখানেই থেমে থাকেননি মুসলিম শিল্পী। তাঁর সৃজনশীল অগ্রগতি ঘটেছিল যখন এটি তার মনে হয়েছিল যে, প্রকৃতির একটি বস্তুতে আল্লাহকে প্রকাশ করা এক জিনিস, এবং এই ধরনের চিত্রে তাঁর অব্যক্ততা প্রকাশ করা অন্য জিনিস। আল্লাহকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর সীমা অতিক্রম করে তিনি মহিমান্বিত হন যা দৃশ্যত অবর্ণনীয়। এটিই হলো মানুষের পক্ষে সম্ভব সর্বোচ্চ নান্দনিক উদ্দেশ্য। আল্লাহ পরম, সর্বশ্রেষ্ঠ। সৃষ্টির কোনো কিছু দ্বারা তাঁকে অবর্ণনীয় বলে বিবেচনা করা হলো তাঁর নিরঙ্কুশতা ও মহত্বকে কঠোরভাবে ধরে রাখা। কারো কল্পনায় সৃষ্ট যেকোনো বস্তু থেকে তাঁকে আলাদা বলে বিবেচনা করা হলো সৃষ্টিতে যা কিছু আছে তার বিপরীতে তাঁকে নিজের কল্পনায় দেখা; তাঁকে 'সুন্দর– অন্য যেকোনো সুন্দর বস্তুর মতো নয়' হিসেবে দেখা। ঐশ্বরিক অব্যক্ততা একটি ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য যার অর্থ অসীমতা, পরমতা, চূড়ান্ততা বা শর্তহীনতা, সীমাহীনতা। অসীম প্রতিটি অর্থেই অব্যক্ত।

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য।

ইসলামী চিন্তার এই ধারার অনুসরণে মুসলিম শিল্পী সজ্জাশিল্পের উদ্ভাবন করেন এবং এটিকে 'অ্যারাবেস্কে'

মদিনায় মসজিদে নববির অভ্যন্তর।

রূপান্তরিত করেন, যা সব দিক থেকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অ-উন্নয়নমূলক নকশা। অ্যারাবেস্ক প্রাকৃতিক বস্তুকে রূপান্তরিত করে একটি ওজনহীন, স্বচ্ছ, ভাসমান প্যাটার্নে সাজায়, যা সমস্ত দিকে অসীমভাবে প্রসারিত হয়– হোক সেটি টেক্সটাইল, ধাতু, ফুলদানি, প্রাচীর, ছাদ, স্তম্ভ, জানালা বা বইয়ের পৃষ্ঠা। প্রাকৃতিক বস্তুটি নিজে নয় বরং আন্তঃপ্রমাণিত (trans-substantiated)। এটি শুধু একটি লক্ষ্যের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নান্দনিকভাবে প্রাকৃতিক বস্তু অ্যারাবেস্কের অধীনে অসীমের একটি জানালায় পরিণত হয়েছে। এটিকে অসীমতার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হলো অতিক্রম করার অর্থের একটিকে স্বীকৃতি দেওয়া, একমাত্র প্রদত্ত– যদিও তা শুধুমাত্র নেতিবাচকভাবে সংবেদনশীল উপস্থাপনা এবং অন্তর্দৃষ্টিতে দেখার জন্য।

এটি ব্যাখ্যা করে কেন মুসলিমদের দ্বারা নির্মিত বেশিরভাগ শিল্পকর্ম বিমূর্ত ছিল। এমনকি যেখানে গাছপালা, প্রাণী এবং মানুষের চিত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, শিল্পী তাদের এমনভাবে স্টাইল করেছেন যাতে তাদের সৃষ্টিশীলতাকে অস্বীকার করা যায়, অস্বীকার করার জন্য যে, কোনো অতিপ্রাকৃত সারবস্তু তাদের মধ্যে বসবাস করে। এই প্রচেষ্টায় মুসলিম শিল্পীকে তার ভাষাগত এবং সাহিত্যিক উত্তরাধিকার দ্বারা সহায়তা করা হয়েছিল।

একই লক্ষ্যে তিনি আরবি লিপির বিকাশ ঘটান যাতে এটিকে একটি অসীম অ্যারাবেস্কে পরিণত করা যায় এবং ক্যালিগ্রাফার এটিকে পরিবর্তন না করে পছন্দের দিকে অসীমভাবে প্রসারিত করতে পারে। একই কথা মুসলিম

মসজিদ বাতি, মিশর, ১৩৬০ খ্রি.।

স্থপতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যার বিল্ডিংটি তার সম্মুখভাগ, উচ্চতা, আকাশরেখা এবং মেঝে পরিকল্পনায় একটি অ্যারাবেস্ক। সকল শিল্পী যাদের বিশ্বদর্শন হলো ইসলাম, তাদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে তাওহিদ হলো সর্বজনীন (common), তারা ভৌগোলিক বা জাতিগতভাবে যতই আলাদা হোক না কেন।[৪৭]

তথ্যনির্দেশ

১. ইসলামের একটি সারমর্ম থাকার বিষয়ে বা এটি পরিচিত বা জ্ঞাত বলে প্রাচ্যবিদদের সন্দেহ প্রসঙ্গে দেখুন আমার যুক্তিখণ্ডন: "The Essence of Religious Experience in Islam", *Numen,* 20 (1973), পৃ : ১৮৬-২০১।

২. এখানে তাওহিদবাদ বর্ণিত 'প্রভুর' ধারণাটি সুফিবাদ এবং হিন্দুদর্শনে বর্ণিত 'স্রষ্টার' ধারণার চাইতে পৃথক, যেখানে স্রষ্টা তার সৃষ্টিজগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং মুক্ত; স্রষ্টাভিন্ন জগতের সবকিছুই যেন মরীচিকা! অন্যদিকে প্রাচীন মিশরীয়, গ্রিক এবং তাওবাদের দর্শন থেকেও তাওহিদের দর্শন ভিন্নতর; মিশরীয়, গ্রিক এবং তাওবাদী দর্শনে সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) ধারণা বিদ্যমান; যেখানে মনে করা হয় যে, স্রষ্টা তার সৃষ্টির মাঝে বিলীন। *তাওহিদ* একথা বলে না যে, সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা লীন হয়ে গেছেন। কারণ, এমন ধারণা একসময় ফেরাউনরা সৃষ্টি করেছে, যারা মনে করত তারা স্রষ্টার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। গ্রিক-রোমানরা তাদের অভিজাত বীরদের মাঝে খোদায়িত্ব আরোপ করত। খ্রিষ্টবাদ যিশুকে খোদার পুত্র ঘোষণা করে *তাওহিদ* থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। এতসব ভ্রান্তির মাঝে ইসলাম বর্ণিত তাওহিদবাদ আল্লাহর অনুপমত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, প্রভুত্ব বজায় রেখে তাঁর সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের বিষয়টি যথাযথ বাস্তবতার নিরিখে বর্ণনা করেছে।

৩. এ মূলনীতি এটিই নিশ্চিত করে যে, মানুষ চাইলেই স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। এর অর্থ কখনও এটি নয় যে, মানুষ এবং আল্লাহ কখনও একীভূত হয়ে যাবে। এর মানে এটিই যে, আল্লাহ সরাসরি মানুষকে নির্দেশনা দেন তাঁর প্রেরিত নবি-রাসূলদের মাধ্যমে; তাঁর ইলহামের মাধ্যমে। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে নবুয়ত, ওহি এবং ইলহাম একটি যোগাযোগ সূত্র। অবশ্যই এটি স্রষ্টার পৃথক অস্তিত্ব নিশ্চিত রেখেই হয়।

৪. কুরআন ৩:১৯১ এবং ২৩:১১৬ ।

৫. কুরআন ৭:১৫; ১০:৫; ১৩:৯, ১৫:২৯, ২৫:২, ৩২:৯; ৩৮:৭২; ৪১:১০; ৫৪:৪৯; ৬৫:৩; ৭৫:৪; ৮০:১৯, ৮২:৭, ৮৭:২-৩।

৬. কুরআন ১৭:৭৭; ৩৩:৬২; ৩৫:৪৩; ৪৮:২৩; ৬৫:৩।

৭. এ বিবেকবোধ মানুষকে অন্য যেকোনো প্রাণীর চাইতে মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। মানুষ যেকোনো মন্দ কাজ করলে বিবেকের দংশনে ভোগে; এটি আর কোনো সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই।

৮. প্রাগুক্ত: ৪, ৫।

৯. মানুষ প্রসঙ্গে কুরআনে দেখুন, ১৩:২, ১৪:৩২-৩৩, ১৬:১২, ২৪, ২২:৩৬-৩৭, ৬৫; ২৯:৬১, ৩১:১০, ২৯, ৩৫:১৩, ৩৮:১৮, ৩৯:৫, ৪৩:১৩, ৪৫:১১-১২।

১০. এ প্রসঙ্গে কুরআনে সার্বিকভাবে বলা হয়েছে।

১১. দেখুন, কুরআন ৭৫:৩৬, ৮৮:২৬; ৪:৮৫।

১২. আল্লাহ মানুষকে তাদের ঈমানদার বন্ধুদের সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন: ৪:১৫৬, ৬:১১৬, ১৪৮; ১০:২৬, ৬৬; ৪৯:১২; ৫৩:২৩, ২৮।

১৩. এই গ্রিক শব্দটির কোনো আরবি প্রতিশব্দ নেই।

১৪. পাশ্চাত্য দর্শন যুক্তিকে ওহির ওপর স্থান দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি এক বিশাল ভ্রান্তি। কারণ মানুষের যুক্তি, প্রজ্ঞা এবং গবেষণার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। একমাত্র ওহিলব্ধ জ্ঞানই সর্বোচ্চ। এক্ষেত্রে ১৪শ' বছরে মুসলিম দার্শনিকরা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ঐশী জ্যোতি বা ওহির ওপর আস্থা বজায় রেখে বাস্তবসম্মত একটি যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

১৫. কুরআন ৫:৯০, ৭:১৩, ৬৬:১, ৬:১১৯, ১৫৩।

১৬. কুরআন ৬:৪২; ১২:১০৯; ১৩:৪০; ১৪:৪; ১৫:৯; ১৬:৪৩; ১৭:৭৭, ২১:৭; ২৫;২৩: ৪৪; ২৫:২০; ৩০:৪৭; ৩৭:৭২; ৪০:৭০।

১৭. কুরআন ৪:১৬২; ৩৫:২৩।

১৮. কুরআন ৩০:৩০।

১৯. কুরআন ৯৪:৬।

২০. কুরআন ৪৯:৬।

২১. এ বিষয়ে মূলগ্রন্থ *The Cultural Atlas of Islam* (Chpater 14) দেখুন।

২২. প্রকৃতির সবকিছুই একক প্রভুর মহান পরিচালনায় একটি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এই মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রকৃতিবিজ্ঞান নিয়ে কোনো আলোচনা করতে পারি না। ইসলামই সর্বপ্রথম এই মহাসত্যটি বিশ্বের জ্ঞানের জগতে দিয়েছে। তা না হলে একেক দেব-দেবী ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের মালিক এমন যুক্তির ভিত্তিতে প্রকৃতিবিজ্ঞান জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে বিকশিত হতো না।

২৩. প্রকৃতিবিজ্ঞান ইতিহাসের মতো নয়। ইতিহাস কোনো বিশেষ ঘটনাকে স্থান-কাল-পাত্রের নিরিখে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে প্রকৃতিবিজ্ঞান যেকোনো বিষয়ে জাগতিক কার্যকারণ পর্যালোচনা করে।

২৪. সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানববিদ্যার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যেখানে উদ্দেশ্য হলো মানবাচরণ, ব্যক্তি বা সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণকারী আইন প্রতিষ্ঠা করা।

২৫. কুরআন ৫১:৫৬ ('আমি জিন ও মানুষ জাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি')।

২৬. কুরআন ২:৩০, ৬:১৬৫; ১০:১৪।

২৭. কুরআন ৩৩:৭২।

২৮. কুরআন ১৫:২৯, ২১:৯১, ৩৮:৭২, ৬৬:১২।

২৯. সেন্ট অগাস্টিন ব্যবহৃত টার্ম।

৩০. কুরআন ১১:৭; ১৮:৭; ৪৭:৩১; ৬৭:২।

৩১. কুরআন ৯:৯৫, ১০৬।

৩২. কুরআন ৯৯:৭-৮, ১০১:৬, ১১।

৩৩. কুরআন ১:৬১।

৩৪. কুরআন ২:৫৭, ১৭২, ৫:৯০; ৭:৩১, ১৫৯; ২০:৮১; ৬৭:১৫; ৯২:১০।

৩৫. কুরআন ৫৫:৩৩ ('তোমরা যদি পৃথিবী ও মহাকাশমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হও, তবে একবার পালিয়েই দেখো না। আসলেই তোমরা পালিয়ে যেতে পারো না! তোমাদের সেই শক্তি, সামর্থ্য নেই')।

৩৬. কুরআন ৫৭:২৭, ২৮:৭৭, ২:২০১, ৭:১৫৬, ১৬:৩০, ৩৯:১০ 'অবশ্য দুনিয়ার সম্পদ থেকে তোমার হক আদায় করতে ভুলে যেয়ো না' (২৮:৭৭)। '*রাহবানিয়াত* তারা নিজেরা তৈরি করেছে' (৫৭:২৭)। 'হে আল্লাহ! আমাদের এই দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো' (২:২০১, ৭:১৫৬)। আল্লাহ আরও নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তিনি নেককার লোকদের দোয়ার জবাব দেবেন এবং দুনিয়াতেও তাদের কল্যাণ দেবেন (১৬:৩০, ৩৯:১০)।

৩৭. কুরআন ২১:৯২, ২৩:৫৩।

৩৮. কুরআন সূরা আল-আসর, আরও দেখুন ৪৯:১০।

৩৯. কুরআন ৩:১০৩।

৪০. কুরআন ৩:১১০, ৫:৮২, ৯:১১৩, ২০:৫৪, ১২৮।

৪১. কুরআনের ৩:৩২; ১৩২; ৪:৫৮; ৫:৯৫; ২৪:৫৪; ৪৭:৩৩; ৬৪:১২।

৪২. কুরআনের আয়াত *ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম*, এছাড়াও রাসূল সা. তাঁর বিদায় হজের অমর ভাষণেও সকল মানুষ সমান মর্যাদার - এমন ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন।

৪৩. রাসূল সা. মুসলিম জাতিকে একটি সুনির্মিত ভবনের সাথে তুলনা করেছেন যার এক অংশ আরেক অংশের দৃঢ়সংবদ্ধ এবং তিনি শরীরের সাথেও তুলনা করেছেন, যার এক অংশে আঘাত লাগলে পুরো শরীরেই তার ব্যথা অনুভূত হয়, পুরো শরীরই সমানভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

৪৪. কুরআন ৪২:২১।

৪৫. এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Ismail al Faruqi, *'Islam and Art'*, Studia Islamica, 37 (1973), পৃ : ৮১-১০৯।

৪৬. I. R. al Faruqi, "On the Nature of the Religious Work of Art", *Islam and the Modern Age*, 1 (1970), পৃ : ৬৮-৮১।

৪৭. তাওহিদের সাথে অন্যান্য শিল্পকলার সম্পর্ক বিষয়ে আরও জানতে পড়ুন: *The Cultural Atlas of Islam* (Chpater 19-23) এবং লোইস লামিয়া ফারুকির *Aesthetic Experience and the Islamic Arts*, Islamabad, Hijrah Centenary Committee, 1405/ 1985.

গ্রন্থ-পরিচিতি

'ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম' গ্রন্থটি বিশ্বের অন্যতম মুসলিম স্কলার ইসমাইল রাজি আল-ফারুকি রচিত *The Essence of Islamic Civilization* -এর বঙ্গানুবাদ। এটি নিউইয়র্কের Macmillan Publishing Company কর্তৃক ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত দ্য কালচারাল অ্যাটলাস অব ইসলাম গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রন্থটিতে তাওহিদকে (আল্লাহর একত্ব) ইসলামের মর্মকথা ও সভ্যতার নিয়ামক নীতি হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাওহিদই মানুষের সার্বিক জীবনকে পুনর্গঠন করেছে, সভ্যতার প্রতিটি উপাদানকে নতুন ছাঁচে গঠন করেছে এবং ইসলামী সভ্যতাকে স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে।

ইসলামী সভ্যতায় বিশ্বদর্শন, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, সামাজিকতাবাদ ও নন্দনতত্ত্বের মূলনীতি হচ্ছে তাওহিদ- যা বৈচিত্র্য, ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিশ্বাস, জ্ঞান-প্রজ্ঞায় উৎকর্ষতা এনে বিশ্বে ইসলামের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করেছে এবং মুসলিম সভ্যতা উন্নীত হয়েছে মানবসভ্যতার সর্বোচ্চ সোপানে।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক ড. ইসমাইল রাজি আল ফারুকি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ইসলামিক ইন্টেলেকচুয়ালিজম-এর স্বপ্নদ্রষ্টা। বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তিক ইসলামি চিন্তার বিকাশের অগ্রপথিক; যিনি নিজের কাজকর্ম, গবেষণা, শিক্ষকতা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। কলেজ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা জন্মভূমি ফিলিস্তিনে। ১৯৪১ সালে বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতক, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও ১৯৫২ সালে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে পিএইচডি লাভ করেন। ছাত্রজীবনেই ইংরেজি, আরবি ও ফরাসি ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৯৫৪-১৯৫৮ সালে ইসলামের ওপর উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। পরবর্তীতে মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলাম ধর্ম ও আমেরিকার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্মের ওপর পোস্ট ডক্টরেট করেন। ইসলাম, খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয়।

১৯৪৫ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে ফিলিস্তিন সরকারের গ্যালিলির জেলা গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়, করাচীর ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ, নিউইয়র্কের সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকার টেম্পল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন। এছাড়া তিনি বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপক ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন।

ড. রাজি আন্তর্জাতিক জার্নাল ও ম্যাগাজিনে শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তার প্রকাশিত দ্য কালচারাল অ্যাটলাস অব ইসলাম, হিস্ট্রিক্যাল অ্যাটলাস অব দ্য রিলিজিয়ন্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড, ট্রায়লগ অব দ্য এব্রাহামিক ফেইথস, খ্রিস্টিয়ান এথিক্স, আল তাওহীদ: ইটস ইমপ্লিকেশন্স ফর থট এন্ড লাইফ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ১৯২১ সালে জন্ম নেয়া ড. রাজি এবং তার স্ত্রী লুইস লামিয়া ফারুকি ১৯৮৬ সালের ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্রে নিজ বাসায় আততায়ীর গুলিতে শহীদ হন। একজন সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীর কর্মঘন জীবন নীরব হয়ে যায়।

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ISBN: 978-984-98129-2-0